বিজ্ঞান মেলা

ছোটদের জন্য বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা

সেপ্টেম্বর ১৯৮৩
ভাদ্র ১৩৮৯
দু' টাকা পঁচিশ পয়সা

বিজ্ঞান মেলা এই সংখ্যায়...

মশা কি অহিংস হয় ?
জলে চূণ ফোটে কেন ?
ক্ষুদে বিজ্ঞানীর প্রজেক্ট ফ্যান মোটর
আবিষ্কারের গল্প
গতসংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে ধারাবাহিক সায়েন্স ফিকশন 'সে আসছে !'

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

শুভারম্ভ জুলাই ১৯৮৩

অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা
পরিচালিত

শ্রীরামপুর স্টাডি সার্কেল

কে, এম, সাহা ষ্ট্রীট. শ্রীরামপুর

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রী কোর্স স্নাতোকোত্তর, প্রাইভেট, রেগুলার

যে কোন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের যোগাযোগ করিবার স্থান

শ্রীঅলক কুমার বাগ পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক
শ্রীরামপুর নন্দলাল ইনষ্টিটিউশন
চাতরা, শ্রীরামপুর

শ্রীস্বপন কুমার চ্যাটার্জ্জী রসায়ণ বিভাগের শিক্ষক
শ্রীরামপুর নন্দলাল ইনষ্টিটিউশন
চাতরা, শ্রীরামপুর

কলিকাতায় যোগাযোগ করিবার স্থান

শ্রীঅমল কুমার ঘোষ
জয়মালা ২৯/২, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— অভিজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত সঙ্গীত বিভাগ ও কলাকেন্দ্র

যোগাযোগের স্থান **শ্রীমতী অপর্ণা বাগ**
২৭, বাজার লেন, শ্রীরামপুর (ঝাউতলার নিকট)

বিজ্ঞান মেলা—বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মাসিক বিজ্ঞান-পত্রিকা। সি. এস. আই. আর. কর্তৃক স্বীকৃত একমাত্র বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা।

□

সম্পাদক
অমিত চক্রবর্তী
সুভাষ সান্যাল

□

সম্পাদকীয় দপ্তর
৫৩/সি, মতিলাল নেহেরু রোড,
কোলকাতা-৭০০০২৯
ফোন—৪৭-৬৯৮০

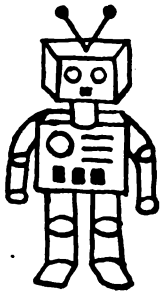

□

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা
২৪ টাকা (সডাক)

অসীম চক্রবর্তী কর্তৃক ১৭৩, অশোকগড় কোলকাতা-৭০০০৩৫ থেকে প্রকাশিত এবং সত্যনারায়ণ প্রেস,১, রমাপ্রসাদ রায় লেন, কোলকাতা-৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।

বিজ্ঞান মেলা

সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ * ৩য় বর্ষ ৫—৯ সংখ্যা * ভাদ্র ১৩৯০

ছড়া

রোবোট OPD2 | পার্থ মুখোপাধ্যায় ২২৫

সায়েন্স ফিক্‌সন্

দি হর্ণ অফ্ প্লেন্টি | ভ্লাদিমীর গ্রীগরিয়েভ ২০০
সে আসছে | হীরেন চট্টোপাধ্যায় ২১১

জ্ঞান-বিজ্ঞান

অসুখটা ক্যানসার | রীতা চৌধুরী ২০৩
স্ফূর্তির অভাবই কি ক্যানসারের কারণ ? | ২০৭
প্রাণদায়ী শৈবাল | অমিয়াংশু চট্টোপাধ্যায় ২০৯
হাতিয়ার থেকে যন্ত্র | মির্জা নৌশাদ ২১৪
চিড়িয়াখানার মেনু | পুলক চট্টোপাধ্যায় ২১৬
মহাশূন্যে খেলাধূলো | মনোজ ঘোষ ২২১
ট্যারা চোখের কারসাজি | সৌমেন দাস ২২৪
বিশ্ব জুড়ে বিচিত্র প্রাণ | কৃষ্ণা ঘোষাল ২৩৫

অনুবাদ

পরমাণু শক্তির গল্প | লরা ফের্মি ২৩১

নিয়মিত বিভাগ

বিজ্ঞানের খবর ১৯৬ জেনে রাখা ভাল ১৯৭ যা নিয়ে এখন হৈ চৈ ১৯৮ ক্ষুদে বিজ্ঞানীর দপ্তর ২২৬ মনের জানালা ২২৯ জানো কি ? ২৩৮ শরীর স্বাস্থ্য ২৩৯ ধাঁধা ২৪২

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ | প্রদীপ বিশ্বাস

* অনিবার্য কারণে বৈশাখ—শ্রাবণ সংখ্যা প্রকাশ করা গেল না। এর জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। গ্রাহক থাকার মেয়াদ চার মাস বাড়ান হল।

খবর

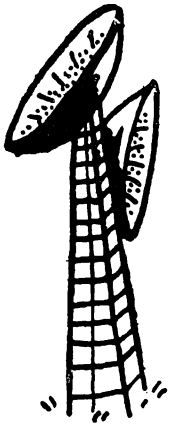

টেষ্ট টিউব কাব

প্রত্যেক দেশেই সে দেশের জীবজন্তুর আলাদা আলাদা কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর তা আছে বলেই তো চিড়িয়াখানায় নানান দেশের নানান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবজন্তুর সমাবেশ ঘটাতে কর্তৃপক্ষের এতো প্রচেষ্টা। কিন্তু এক দেশ থেকে জীবজন্তুকে আর এক দেশে বয়ে আনবার ঝামেলা, অর্থব্যয় ও নানা নীতির প্যাঁচ এতো বেশী যে, সে জন্যেই বিজ্ঞানীরা এক দেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবজন্তু অন্য এক দেশে বসে তৈরী করার এক আজব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এক দেশের জলবায়ু আর এক দেশের জলবায়ুর থেকে আলাদা হওয়ার ফলে এটা তৈরী করা খানিকটা অসম্ভব হলেও বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই অসম্ভব ঘটনাকেই সম্ভব করেছেন। সম্প্রতি বারহারবারের জ্যাকসন্ ল্যাবরেটরির কয়েকজন বিজ্ঞানী জানিয়েছেন যে এক দেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীব আর এক দেশের পরীক্ষাগারে তৈরী সম্ভব।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, যদি এরকম জীবের ডিম্বকোষবিশিষ্ট ভ্রূণকে একটি ছোট কাচের শিশিতে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো হয় এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবার পর ঐ ভ্রূণটিকে ঐ জাতীয় স্ত্রী-প্রাণীর গর্ভে সঞ্চার করা হয় তবে দেখা গেছে যে ঐ ভ্রূণ থেকে ঐ শ্রেণীর জীবজন্তু জন্মাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা আরো জানাচ্ছেন যে ঐ ভ্রূণটিকে পাঠাবার সময় যদি ভ্রূণশুদ্ধ শিশিটি দেহের তাপমাত্রায় রাখা যায় তবে প্রাণীর জন্মাবার হার বৃদ্ধি পায়। ব্যাপারটার সত্যতা বিচারের জন্য তাঁরা একটা পরীক্ষা করলেন। তাঁরা ভ্রূণশুদ্ধ একটি শিশি দেহের তাপমাত্রায় রেখে অন্য জায়গায় পাঠালেন ও অনুরূপ আরেকটি শিশিকে কোন এক সাধারণ ব্যাগে ভরে পাঠালেন। তারপর তাদের পুরে দেওয়া হল আলাদা আলাদা মা প্রাণীর দেহে। দেখা গেল, যে শিশিটি দেহের তাপমাত্রায় ছিল সেই শিশি থেকে প্রাণীর জন্মানোর হার অপর শিশির তুলনায় অনেক বেশি।

কৃত্রিম নদী

নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা এক বৈপ্লবিক ব্যাপার —তাই না? নদীর খেয়ালে দেশের কোন অংশ শস্যসবুজ আবার কোথাও রুক্ষ নিষ্ফলা মরুভূমি। রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখছেন। সে দেশের দক্ষিণ দিকটিই বেশী শস্যশ্যামলা, সেখানেই বাস করে সোভিয়েত ইউনিয়নের চারভাগের তিনভাগ মানুষ। আর এখানেই গড়ে উঠেছে যত শিল্প। অথচ প্রকৃতির ভুলেই যেন দেশের উত্তর দিক দিয়ে বয়ে চলেছে যত নদী। গত প্রায় ২০ বছর ধরে রাশিয়ান ইঞ্জিনীয়াররা চেষ্টা করে চলেছেন কিভাবে উত্তরের ওই নদীর জলের প্রাচুর্যের ভাগ নিয়ে আসা যায় দক্ষিণে। এ পর্যন্ত কমপক্ষে প্রায় ৬০টি কারিগরী সংস্থায় ইঞ্জিনীয়াররা এই নিয়ে কাজ করছেন। বিভিন্ন বড় বড় নদী থেকে জল বাঁধ, Pumping Station, জলাধার, খাল বা হ্রদের মাধ্যমে দক্ষিণে প্রবাহিত নদী ভলগায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এছাড়া সাইবেরিয়ান প্রজেক্টে প্রায় দেড় হাজার মাইল লম্বা একটি খাল কাটার পরিকল্পনা আছে যা দিয়ে ইতিশ নদী থেকে জল দক্ষিণের কাজাখস্থান, উজবেকিস্থানের সমতলভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে নদীও কৃত্রিম হতে চলল!

অহিংস মশা !

ম্যালেরিয়া আজকে আবার নতুন করে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। মশা নিরোধের কত রকম যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে, কিন্তু তার কোনটাই খুব বেশী ফলপ্রসূ হচ্ছে না। মশক বাহিনী ক্রমেই সব রকম মারণাস্ত্রকে থোড়াই কেয়ার করতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনাও তাই বিচিত্র সব পথ ধরে এগোচ্ছে।

World Health Organigation-এর উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে ম্যালেরিয়ার টীকা নিয়ে গবেষণাও শুরু হয়ে গেছে ; কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এক নতুন পথে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছেন।

প্রথমে তাঁদের মাথায় চিন্তা এলো যে মশা কেন কামড়ায়। এই বিজ্ঞানীরা হলেন Texas A & M University-র R.W. Meola এবং R. S. Petralia ; এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন যে স্ত্রী মশারা প্রথম দিকে গাছের রস খায় কিন্তু প্রাণীদেহের রক্ত না খেলে তাদের বংশবৃদ্ধি হয় না। এবং এর জন্য দায়ী জুভেনাইল হরমোন নামে একটি রাসায়নিক। এই হরমোনের তাড়নাতেই তারা মানুষকে কামড়ায়।

বিজ্ঞানীর দল ঠিক করলেন যে এই জুভেনাইল হরমোনের নিঃসরণকে সংযত করে দেখা যাক মশারা মানুষকে কামড়ায় কি না। তাঁরা কিউলেক্স প্রজাতির মশা নিয়ে এ পরীক্ষা করলেন। দেখা গেল এই উৎসেচকের ঘাটতির ফলে রক্তের প্রতি মশাদের লোভ কমে যায়।

সুতরাং এই নতুন পদ্ধতিতে মশাদের কিভাবে অহিংস করে তোলা যায় তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা নতুন পথে গবেষণার এক গুপ্ত দরজার সন্ধান পেলেন। এই পথে গবেষণা যদি সফল হয় তাহলে শুধু ম্যালেরিয়া নয় সেই সঙ্গে ফাইলেরিয়া, ইয়েলো ফীভার, ডেঙ্গু, এনকেফেলাইটিস্—এসব অসুখ চিরদিনের মত নির্মূল হবে। কানের পাশে মশার বিচিত্র রাগিণীও তখন বোধহয় আর বিরক্তি জাগাবে না।

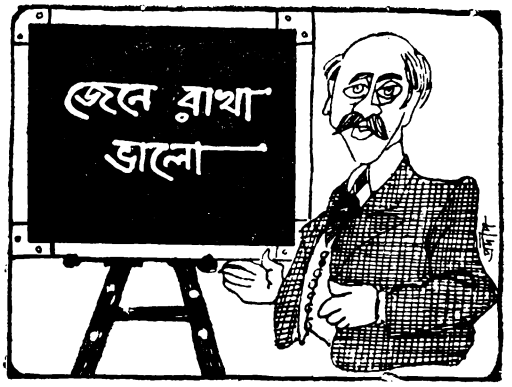

কাঠের চেয়ারের তুলনায় লোহার চেয়ারে বসলে বেশি ঠাণ্ডা লাগে কেন ?

লোহা তাপের সুপরিবাহী। লোহার চেয়ারে বসামাত্র তাই লোহা আমাদের শরীর থেকে তাপ টেনে নেয়। ফলে মুহূর্তের মধ্যে ঠাণ্ডার অনুভূতি হয়। কিন্তু কাঠ তাপের কুপরিবাহী। এই কারণেই কাঠের চেয়ারের তুলনায় লোহার চেয়ারে বসলে বেশি ঠাণ্ডা লাগে। এই কারণে শীতপ্রধান দেশে কাঠের তৈরী চেয়ার বেশি ব্যবহার করা হয়।

সকালের সেদ্ধ ডিম কি দুপুরে খাওয়া যায় ? এতে খাদ্যগুণ কতক্ষণ থাকে ?

সেদ্ধ ডিম মানেই তার কোষগুলো মৃত। ডিমটি বাতাসের সংস্পর্শে এলে ধীরে ধীরে খারাপ হতে পারে। তবে ডিমের খোলাটা না ছাড়িয়ে রাত্রি পর্যন্ত রেখে দিলেও সাধারণতঃ ডিম খারাপ হয় না, খাওয়া যায়। খাদ্য-গুণ কতটা থাকবে তা অবশ্য নির্ভর করে ডিমটা কতটা সেদ্ধ হয়েছে তার ওপর। বেশি সেদ্ধ হলে খাদ্যগুণ খুব কমই থাকে—হজমেও অসুবিধে হয়।

জলে চুন দিলে জল ফুটতে শুরু করে কেন ?

জলের মধ্যে চুন বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড মেশালে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড বা কলিচুন তৈরী হয়। এটি একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপের প্রভাবেই জল গরম হয়ে ফুটতে শুরু করে।

যা নিয়ে এখন হৈ চৈ

পায়োনীয়ার-১০ সৌরজগতের সীমা ছাড়ালো

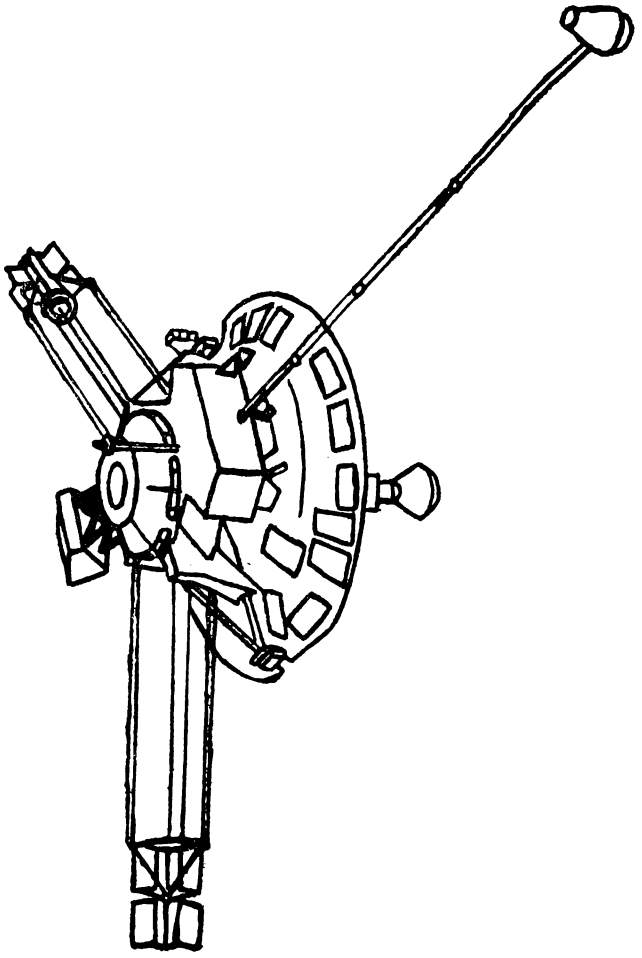

এই বছরের (১৯৮৩ সালের) ১৩ই জুন। বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল ছোট্ট একটা খবর। বিজ্ঞানীমহল থেকে শুরু করে সাধারণ কৌতূহলী মানুষের মনে তুলল চাঞ্চল্যের ঝড়; হাজারো প্রশ্ন। মানুষের তৈরী মহাকাশযান পায়োনীয়ার—১০ গত ১৩ই জুন সূর্য থেকে ৪৪৯৭ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরের নেপচুনের কক্ষপথ ছাড়িয়ে পাড়ি দিয়েছে সৌরজগতের বাইরে—নক্ষত্রলোকের দিকে। এ সময়ে পায়োনীয়ারের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৩০৫৫৮ মাইল।

১৯৭২ সালের তেসরা মার্চ কেপ কেনাভেরল মহাকাশযান উৎক্ষেপণকেন্দ্র থেকে পায়োনীয়ার—১০কে পাঠানো হয় মহাকাশের পথে। পৃথিবী থেকে পাঠানো অন্য কোন মহাকাশযানই এ পর্যন্ত মঙ্গল গ্রহের চেয়ে বেশি দূরত্ব পাড়ি দিতে পারে নি। কিন্তু পায়োনীয়ার—১০ ছিল এ সব মহাকাশযানের থেকে আলাদা। ১৯৭৩ সালের দোসরা ডিসেম্বর পায়োনীয়ার—১০ পৌঁছায় সৌর-

জগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতিতে। তারপর একে একে সে ১৯৭৬ ও ১৯৭৯ সালে অতিক্রম করে শনি ও ইউরেনাসের কক্ষপথ।

মহাকাশে কোন মহাকাশযান পাঠাতে গেলে প্রয়োজন হয় প্রচুর শক্তির যা মহাকাশযানটিকে দেয় প্রচণ্ড গতি। পৃথিবীর আকর্ষণবল কাটাতে গেলে মহাকাশযানের গতিবেগ ঘণ্টায় অন্ততপক্ষে ২৪,২০০ কিলোমিটার হওয়া প্রয়োজন। আধুনিক যুগে সাধারণ মহাকাশযানেতে তরল জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়—তরল অক্সিজেন ও কেরোসিন অথবা তরল হাইড্রোজেন। প্রায় ৫০০ পাউণ্ড ওজনের পায়োনীয়ার—১০-এর জ্বালানীতেও একটু বৈচিত্র্য আছে। পায়োনীয়ার—১০-এর জ্বালানী পরমাণুশক্তি।

মহাকাশে পাঠাবার পর থেকে পায়োনীয়ার—১০ বেতার সংকেতের মারফৎ পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ রেখেছে। এইভাবে পায়োনীয়ার নানা গ্রহ, উপগ্রহ সম্বন্ধে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের জানিয়ে চলেছে নানা তথ্য। পায়োনীয়ার—১০ যে-অজানা মহাজগতের পথে পাড়ি দিয়েছে সেখান থেকে আমাদের পৃথিবীটাকে কেমন লাগে দেখতে? দেয়ালের উপর একটা আলোর রেখা এসে পড়লে যে ছোট্ট বিন্দুটা দেখতে পাও, ঠিক অমনি ছোট্ট একটা বিন্দুর মতন! আর আমাদের মাথার উপরের ঐ বিরাট সূর্যটাকে দেখতে লাগে ছোট্ট একটা চাকতির মতো! আর সৌরজগতের বাইরে যে বিশাল, অনন্ত মহাজগৎ, সে জায়গাটা বড় বেশি অন্ধকার আর ঠাণ্ডা। সেই মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে ঘণ্টায় দশ লক্ষ মাইল বেগে ছুটে চলেছে সূক্ষ্ম সৌরকণিকার ঝড়। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পায়োনীয়ার তাদেরকে এ সম্বন্ধে নানা তথ্য পাঠাবে, জ্যোতির্বিদ্‌দের ধারণাকে অভ্রান্ত বলে প্রমাণ করবে। পায়োনীয়ারই প্রথম জানায় মঙ্গল গ্রহে রয়েছে ছোট বড় অসংখ্য পাহাড়। আর বৃহস্পতির আবহমণ্ডলটাই বা কি রকম। আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মতো অক্সিজেন কার্বন-ডাই অক্সাইড কিংবা নাইট্রোজেন সেখানে নেই। তার পরিবর্তে বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল খুব ঘন হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম গ্যাসে তৈরী। পায়োনীয়ার—১০ বৃহস্পতি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানিয়েছে। পায়োনীয়ারের খবর অনুযায়ী বৃহস্পতি গ্রহ সম্পূর্ণটাই তরল অবস্থায় আছে। জানা গেছে, বৃহস্পতির তাপমাত্রা প্রায় ৬ হাজার ডিগ্রি কেলভিন, অর্থাৎ সূর্যের চেয়েও পাঁচ গুণ বেশী। এই তাপমাত্রায় ওখানকার হাইড্রোজেন সম্পূর্ণ তরল অবস্থায় রয়েছে। বৃহস্পতি থেকে প্রায় ২০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত শনিগ্রহ। কিন্তু বৃহস্পতিগ্রহের চৌম্বক শক্তি এত প্রচণ্ড যে তার প্রভাব শনিগ্রহ পর্যন্ত বিস্তৃত।

বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে পায়োনীয়ার-১০ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং ভবিষ্যতে পায়োনীয়ার আমাদের নক্ষত্রলোক সম্পর্কিত কি ধরনের খবরাখবর পাঠাবে তাও মোটামুটি আগেই অনুমান করেছেন। সৌরজগতের দুই গ্রহ নেপচুন ও ইউরেনাস। এই দুই গ্রহ পরস্পরকে কি বলে আকর্ষণ করে তা আজও বিজ্ঞানীদের অজানা। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন সুদূর ভবিষ্যতে এই আকর্ষণ বলের স্বরূপ উদ্ঘাটন করবে পায়োনীয়ারই। সে জানাতে সক্ষম হবে সৌরজগতের সীমারেখার শেষ কোথায় আর কোথা থেকেই বা নক্ষত্রমণ্ডলের শুরু। পায়োনীয়ারের দৌলতে হয়তো জানতে পারব সৌরকলঙ্ক, সৌরঝড়, প্রভৃতি সূর্য সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে নানাবিধ তথ্য, মহাজাগতিক রশ্মিও মহাকর্ষ তরঙ্গ সম্পর্কে আরও নির্ভুল খবরাখবর। বিজ্ঞানীরা হিসেবনিকেশ করে দেখেছেন এরকম গতিতে পায়োনীয়ার এগিয়ে চললে আজ থেকে ১০৫০৭ বছর পরে পায়োনীয়ারের সাথে দেখা হবে 'বারনার্ড' তারার। একে একে যাত্রাপথে পায়োনীয়ারের সাথে দেখা হবে রস—২৪৮, অলটেয়ার সহ আরও আটটি বড় বড় তারার। আর আজ থেকে পাঁচ বিলিয়ন বছর পরে পায়োনীয়ার পৌঁছবে ছায়াপথের শেষপ্রান্তে। ভাবতে পারো সে দিনটার কথা, যেদিন এই পৃথিবী বলে কিছু থাকবে না, সূর্যও নিভে যাবে, মানব-সভ্যতার একমাত্র সাক্ষী পায়োনীয়ার—১০ তখন নক্ষত্রমণ্ডলের শেষ সীমানার দিকে এগিয়ে চলেছে।।

কল্পবিজ্ঞানের গল্প

দি হর্ণ অফ প্লেনটি

ভ্লাদিমীর গ্রীগরিয়েভ্

আগে যা ঘটেছে

মস্কোর সেই পাগলা কারিগরের নাম স্টেপান অগ্রত্সভ। নানা রকম টুকটাক্ জিনিষ সে যেমন সারিয়ে দিত তেমনি নতুন অদ্ভুত যন্ত্র তৈরীর পরিকল্পনাও তার মাথায় ঘুরতো সব সময়। রাস্তার একজায়গায়, দেওয়ালে একটা অদ্ভুত ছবি দেখে স্টেপান একদিন সত্যি সত্যিই বানিয়ে ফেলল একটা যন্ত্র যাতে জঞ্জাল থেকে তৈরী হবে নানা দরকারী টুকিটাকি। পেটেন্ট অফিসের মলক্টোভ স্টেপানকে পেটেন্ট দেবার আগে খুঁটিয়ে দেখলেন যন্ত্রটাকে। ব্যবস্থা করা হলো স্টেপান যাতে জনসাধারণের সামনে এই যন্ত্রটার কাজ করার ক্ষমতা প্রমাণ করতে পারেন। তারপর—]

দিনটা ছিল শরতের এক বিকেল। বৃষ্টিধোয়া ঝকঝকে নীল আকাশের নীচে, শহর থেকে একটু দূরে পরিষ্কার এক মাঠে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রদর্শনী না বলে বরং বলা ভাল অগ্রত্সভের প্রদর্শনী। কর্তৃপক্ষ খবরটা চেপে রাখার চেষ্টা করলেও খবরটা চাপা থাকে নি, দুপুর থেকেই শ'য়ে শ'য়ে লোক এসে ভীড় জমিয়েছে ছোট্ট মাঠটাকে ঘিরে। কারিগর অগ্রত্সভ নাকি এমন এক যন্ত্র বানিয়েছে যা সব ভাঙ্গাচোরা আবর্জনা থেকে নতুন করে কাজের জিনিষ বানাচ্ছে। এ খেলা নিজের চোখে না দেখলে—

—সত্যি, নিজের চোখে না দেখলে অগ্রত্সভও

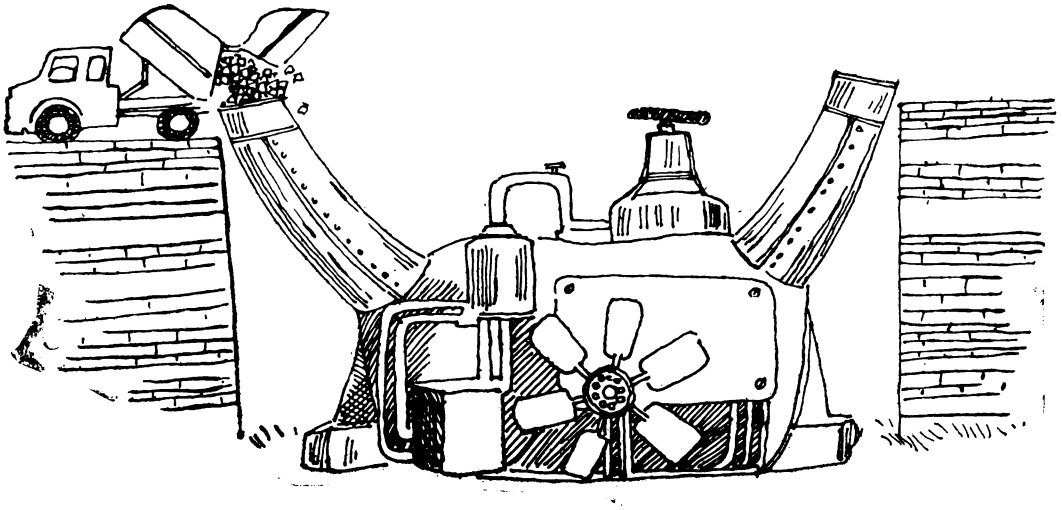

বিশ্বাস করতে পারতো না, তার আবিষ্কারকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন পেটেন্ট বিভাগের কর্তারা। সাজানো গোছানো মঞ্চ, তার ওপর বসানো তার নিজের আবিষ্কার করা যন্ত্র, পাশে দাঁড়ানো একগাড়ী ভর্তি জঞ্জাল—

নাঃ, অকারণেই অগ্রত্সভের মনটা খুশী খুশী হয়ে উঠতে লাগলো।

—আরে, সার্জেন্ট পেত্রোভ, আপনি এখানে যে?

চেনা লোক দেখে অগ্রত্সভ খুশী আর চেপে রাখতে পারে না।

—আসলে আজ আমার এখানে স্পেশাল ডিউটি পড়েছে। এত লোকের ভীড়, বলা যায় না, গণ্ডগোল লাগতে কতক্ষণ? অবশ্য আমি যখন আছি—পেত্রোভ দুহাতে গোঁফের দুপ্রান্ত একটু পাকিয়ে নেয়।

—তা বেশ তো। আপনি না হয় মঞ্চটাকেই পাহারা দিন। কেউ যদি হুট করে উঠে পড়ে—

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ঘাড় ধরে নামিয়ে দেব।

ইতিমধ্যে কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে আসেন।

—মিষ্টার অগ্রত্সভ, এবার তাহলে হাতে-কলমে যন্ত্রটার কার্যক্ষমতা আমরা দেখতে পারি?

—কিন্তু মাত্র একগাড়ী জঞ্জাল দিয়ে কি হবে?

—বলেন কি? আরও জঞ্জাল চাই?

—কতটা দরকার? কর্মকর্তার গলায় বিস্ময়ের আভাস!

—অন্ততঃ গাড়ীদশেক তো বটেই।

আসলে ব্যাপারটা শুরু হলে সেটা চলতেই থাকবে। বিশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ, একশো—যত গাড়ী জঞ্জাল আপনার ইচ্ছে হয় ঢালুন না!

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি কাজ শুরু করুন তো, জঞ্জালের অভাব হবে না। আমি ব্যবস্থা করছি।

ইতিমধ্যে বক্তৃতামঞ্চে মলকুটোভ উঠে পড়েছে। সমবেত জনসাধারণের সামনে ছোট্ট একটা বক্তৃতার অবতারণা করে হাত বাড়িয়ে দেয় অগ্রত্সভের দিকে—

এবার মিষ্টার অগ্রত্সভের পালা। আপনার কারিগরী প্রতিভায় আগামী শতকের যে বিস্ময় আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি অনুগ্রহ করে একবার আমাদের সামনে তা চালিয়ে দেখালে আমরা ভীষণ খুশী হতাম। আসুন মিষ্টার অগ্রত্সভ।

মনের উত্তেজনা চেপে শিঙার মুখটায় বেলচা দিয়ে খানিকটা জঞ্জাল চালান করে অগ্রত্সভ। তারপরে হাতল ঘুরিয়ে যন্ত্রটা চালু করে দেয়।

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। শিঙার মুখটা দিয়ে পরপর জিনিষ বেরিয়ে আসতে থাকে। যান্ত্রিক গর্জনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুরো মাঠটা ফেটে পড়ে দর্শকদের হাততালিতে।

—একটা মোজা!

—দেখ দেখ, 'অ্যাসট্রে' একটা!

জুতো, জামা, পেপারওয়েট, সিগারেটের বাক্স, দুধের বোতল, টিনের কৌটো, ছুরি-কাঁচি, ব্লেড, ব্যাটারী, গেলাস,—নানা টুকিটাকি জিনিষের পাহাড় জমতে থাকে মঞ্চের ওপর। সারা মাঠ নিস্তব্ধ—একটা পিন পড়লেও বুঝি শোনা যায়। তারপরেই স্রোতের মতো জনতা ছুটে আসে মঞ্চের দিকে। পরমুহূর্তেই দেখা যায় একদল মানুষ অগ্রত্সভকে কাঁধে তুলে নাচছে। মানুষজন আনন্দে যেন উন্মাদ হয়ে গেছে—কেউ বাদ নেই। অবশ্য বাদ শুধু একজন—ভীড়ের মধ্যে একটা লম্বা লোক পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। দু-হাত তুলে জনতার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলো—আপনারা শান্ত হোন, শান্ত হোন।

লোকটির নাম পারভোজভ্। লোকে বলে পৃথিবীতে এমন কিছু জিনিস নেই যা পারভোজভ্কে বিস্মিত করতে পারে। সবকিছুই নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে সে সবসময়েই সচেষ্ট। অনেকেই তাকে পছন্দ করে না বটে, অথচ অনেকেই তাকে তার অবিচল স্থির মনোভাবের জন্যে সমীহও করে থাকে।

পারভোজভ্ যখন কিছু বলার জন্য এই মুহূর্তে জনসাধারণকে শান্ত হতে অনুরোধ জানাচ্ছে অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখলো বৈকি!

—বন্ধুগণ! আপনারা শুনুন। এই আবিষ্কারটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ নিয়ে এতবেশী মাতামাতি করার আগে আমাদের এ সম্বন্ধে আরও খুঁটিনাটি কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয় কি?

—আরও খুঁটিনাটি? যন্ত্রটা যে কাজ করছে সেটা তো আমরা নিজের চোখেই দেখছি। ভীড়ের মধ্যে থেকে দু-একজন চেঁচিয়ে ওঠে।

বিজ্ঞের মতো হাসে পারভোজভ্।

—শুধু কাজ করলেই হলো? আর কিছু জানার নেই? আচ্ছা মিষ্টার অগ্রত্সভ, আপনার যন্ত্রে কি এমন কোন ব্যবস্থা আছে যা দিয়ে যে-সব জিনিস তৈরী হচ্ছে তার একটা তাৎক্ষণিক তালিকা বানানো যায়?

—না, মানে এ ব্যাপারটা আমি ভাবিনি। তাছাড়া সময়ও ছিল কম। তবে আপনি যখন বলছেন—

স্টেপান একটু লজ্জিত হয়ে পড়ে যেন।

—আসলে আমরা ভুলগুলো করি এইভাবেই।

বিজয়ীর দৃষ্টিতে চারপাশ তাকিয়ে নেয় পারভোজভ্।

তাড়াহুড়ো করে কোন কাজ করা যায় না, যাবেও না। ধীরেসুস্থে ভাবুন, সেইমতো কাজটা করুন। তবেই তা হবে একেবারে নিখুঁত। ভাল কথা—আপনি বলছেন যন্ত্রটা দুদিকেই কাজ করে, অর্থাৎ জঞ্জাল থেকে যেমন দরকারী জিনিস তৈরী করে এটা, তেমনি দরকারী জিনিসকে ভেঙ্গে তা আবার জঞ্জালে পরিণত করাও সম্ভব এটা দিয়ে। তাই না?

সেটা তো সবসময়ই সম্ভব। কিন্তু তা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে কি?

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে স্টেপান অগ্রত্সভ্।

—অবশ্যই, অবশ্যই। আপনি যখন সেরকম দাবী করেছেন, হাতেকলমে তা দেখাতে হবে বৈ কি।

কর্মকর্তাদের দু একজনও সায় দেন পারভোজভের কথায়—এ আর কি এমন কথা? একবার করে দেখিয়ে দিলেই তো আর তর্কের অবকাশ থাকে না?

—বেশ। তাই হোক তবে। স্টেপান উল্টোদিকে যন্ত্রের হাতল ঘোরায়। অদৃশ্য কোন শক্তির টানে তৈরী হওয়া জিনিষগুলো ঢুকতে থাকে শিঙার ভেতর। সে টান এত বেশী যে চারপাশ থেকে জিনিষপত্র হাওয়ার টানে উড়ে আসতে থাকে মঞ্চের দিকে। ঠিক যেন দমকা হাওয়ায় খড়কুটো উড়ে আসছে ঘূর্ণীর কেন্দ্রের দিকে।

—বসে পড়ুন, বসে পড়ুন। স্টেপান চিৎকার করতে থাকে। জিনিষ ঢোকাবার মুখ বড় বলেই বিপত্তি ঘটছে। কি সর্বনাশ, হাতলটা আটকে গেছে যে। সার্জেণ্ট পেত্রোভ্, আপনি হামাগুড়ি দিয়ে এদিকে একটু আসুন।

—পারভোজভ্কে এখানে আসতে দেওয়াই অন্যায় হয়েছে। ঝড়ের মধ্যে মলকুটোভের গলা শোনা গেল।

দমকা হাওয়ায় পারভোজভের মাথার টুপীটা উড়ে যাচ্ছিল, হাত বাড়িয়ে টুপীটা ধরতে যেতেই আর একটা হাওয়ার ঝাপটা পারভোজভকে ভাসিয়ে নিল শূন্যে।

কেউ কিছু বোঝার আগেই একটা লম্বা তীরের মতো পারভোজভের হালকা শরীরটা সটান ঢুকে গেল শিঙার বড় হাঁ-মুখটার ভেতরে, আর পাঁচটা কৌটো বা খেলনার মতোই। ব্যাপারটা আর কেউ লক্ষ্য না করলেও স্টেপানের তা নজর এড়ায় নি। একলাফে যন্ত্রটার কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে চেপে ধরলো পারভোজভের একটা পা।

—বুদ্ধু কোথাকার! দু-হাত দিয়ে জিনিষগুলো সরাতে থাকো যাতে নিজে না তলিয়ে যাও। সার্জেণ্ট পেত্রোভ, তাড়াতাড়ি অন্য পা-টা ধরুন—স্টেপানের কথা শেষ হবার আগেই যন্ত্রের আওয়াজে পারভোজভের শেষ আর্তনাদ ঢাকা পড়ে গেল; আর সেইসঙ্গে—

হ্যাঁ, সেইসঙ্গে এক হ্যাঁচকা টানে স্টেপানও ঢুকে গেল যন্ত্রটার ভেতর। নীল আলোর ঝলসানি। বিকট একটা আর্তনাদ তুলে থেমে গেল যন্ত্রটা। পেত্রোভ কোনরকমে হাতলটা ঘুরিয়ে দিল উল্টোদিকে। না, এবার কিন্তু হাতলটা ঘোরাতে কোনই অসুবিধে হোল না।

—শিঙার ছোট মুখ দিয়ে ঝরঝর করে বেরিয়ে এলো খানিকটা জঞ্জালের গাদা। —শেষ—

অনুবাদ ঃ শুক্লা সান্যাল

জ্ঞান-বিজ্ঞান

অসুখটা : ক্যানসার

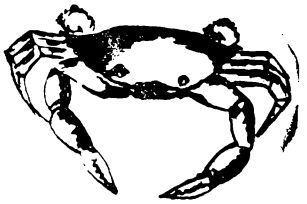

রীতা চৌধুরী

'ক্যানসার'—চার অক্ষরের ছোট্ট একটা শব্দ। কিন্তু নামটা শুনলেই কেমন ভয় ভয় করে—তাই না? তা ভয় পাওয়ারই কথা, কারণ একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় ধরা না পড়লে এ রোগ সারে না, এবং দীর্ঘদিন ধরে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েও আজ অব্দি বিজ্ঞানীরা এই রোগের কোন প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেন নি। আর বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা এখন কি বলছেন জানো? তাঁদের অভিমত, ক্যানসার রোগের হাত থেকে আমাদের কোনদিনই মুক্তি নেই। কারণ আমাদের খাবারদাবার, জীবনযাত্রা, কাজ ও থাকার পরিবেশ—সবকিছুর মাঝেই লুকিয়ে রয়েছে এই রোগের উৎস। তাই তাঁরা এখন ভাবতে শুরু করেছেন কিভাবে এই রোগ শরীরে নিয়েও সুস্থভাবে বাঁচা সম্ভব। আমাদের দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা এখন এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে ক্যানসার রোগের সাথে আমাদের দেহ যুঝতে পারে।

এবার ক্যানসার রোগটা আসলে কি সে বিষয়ে দুচার কথা বলি তোমরা তো জানো আমাদের দেহ অনেকগুলো কোষের সমষ্টি। একটি শিশু—জন্মাবার আগে অব্দি তার দেহের কোষগুলো দ্রুতহারে বিভাজিত হয় কিন্তু শিশুটি জন্মাবার পর থেকে কোষ বিভাজনের হারও কমতে থাকে। পরে এমন একটা সময় আসে যখন শুধু দেহের কোন অংশের বৃদ্ধির জন্য বা মৃত কোষগুলোর শূন্যস্থান পূরণ করবার জন্যই কেবল কোষবিভাজন হয়। প্রত্যেকটা কোষের মাঝখানে থাকে গোলাকার নিউক্লিয়াস আর তার মধ্যে থাকে সরু সরু সুতোর মতো ক্রোমোজম। তোমরা সকলেই মটরশুঁটি দেখেছ নিশ্চয়ই। মটরশুঁটির ভেতর যেমন মটরদানাগুলো পরপর সাজানো থাকে ঠিক তেমনি ক্রোমোজোমের উপর খুব ছোট ছোট দানার আকারে সাজানো থাকে 'জিন'। এই জিনেরাই কোষ বিভাজনের হার নিয়ন্ত্রণ করে। শরীরে কোন জায়গায় কোষের জিনেরা যদি কোন কারণে তাদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তবে শরীরের সেই জায়গার কোষ বিভাজন হঠাৎ খুব বেড়ে যায়। আর কোষের এই অনিয়ন্ত্রিত বিভাজনই কোষটিকে ক্যানসার রোগের শিকারে পরিণত করে। ক্যানসার বহু ধরণের হতে পারে।

যখন কোষ বিভাজন হয় তখন কোষের ক্রোমোজোমগুলো এমন একটা অবস্থায় থাকে যে বাইরের ক্ষতিকারক বস্তুগুলোর প্রভাব ক্রোমোজোমের উপর অনেকাংশে বেড়ে যায়। এই ক্ষতি দুরকমের হতে পারে—স্থায়ী ও অস্থায়ী। স্থায়ী পরিবর্তন আবার হতে পারে তিন ধরনের—রাসায়নিক, পারিপার্শ্বিক ও ভাইরাস-ঘটিত।

প্রথমে রাসায়নিক পরিবর্তনের কথায় আসা যাক। বিভিন্ন কলকারখানায় যারা কাজ করেন তাদের নানা ধরণের রাসায়নিক বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়। এই রাসায়নিক বস্তুগুলোর প্রভাবে তাদের নানা ধরনের ক্যানসার হয়। যেমন যারা চিমনির কাজ করেন তাদের মধ্যে ত্বকের ক্যানসার খুব বেশি দেখা যায়। এই ত্বক-ক্যানসারের আসল আসামী আলকাতরার এক বিশেষ

উপাদান বেনজিপাইরিন। এছাড়াও শিল্পে ক্লোরোটেট্রাফোম, থায়োএসিটামাইন, ডাইমেলোসাইবেনজিন, অ্যাসবেস্টস জাতীয় নানা ধরণের রঞ্জক পদার্থ ব্যবহৃত হয় যারা ত্বক ক্যানসারের জন্য দায়ী।

আমাদের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। তাই পরিবেশের প্রভাবকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। শিল্পনগরীগুলোতে কলকারখানার চিমনি থেকে আমাদের দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক নানা ধরনের রাসায়নিক বস্তু এসে মেশে বাতাসে—যেমন সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন পারঅক্সাইড ইত্যাদি। এছাড়া প্রতিদিন বাস লরী মোটরগাড়ী থেকে হাইড্রোকার্বণ ও অন্যান্য দূষিত গ্যাস বের হয়েও বাতাসকে দূষিত করে তুলছে। ফলে যাঁরা শিল্পনগরীতে থাকেন তাঁদের মধ্যে ফুসফুসে ক্যানসার খুব বেশি দেখা যায়। একই কারণে রাবার বা চামড়ার কারখানায় যারা কাজ করেন, খনিতে যেসব শ্রমিকেরা কাজ করেন, ছাপাখানা বা কাপড়ের কলগুলোতে যারা কাজ করেন তাদের মধ্যে মুখ, নাক, কান, গলনলী, মূত্রাশয়ে ক্যানসার হওয়ার ঘটনা সাধারণের চাইতে অনেকাংশে বেশি। গবেষণার কাজে যারা ল্যাবোরেটরীতে দিন কাটান তাদের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায় ব্লাড ক্যানসার বা লিউকেমিয়া। শিল্পনগরীর জনসাধারণই শুধু নয়, আমাদের দেশের সবাই এখন আর এক সমস্যার সম্মুখীন। আমাদের বায়ুমণ্ডলের উপরে ওজোন গ্যাসের একটা স্তর আছে। এই স্তর থাকার প্রয়োজন খুব বেশি—কেন জানো? মহাশূন্যে সূর্য থেকে নানা ধরণের রশ্মি বের হয়, যেসব রশ্মি আমাদের দেহের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। ওজোন স্তর এইসব মহাজাগতিক রশ্মিগুলোকে আটকে রাখে—আমরাও অনেক বিপদ সহজে এড়াতে পারি। কিন্তু সম্প্রতি বিশেষ করে শিল্পনগরীগুলোতে, এক সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। সেই সমীক্ষায় দেখা গেছে শিল্পনগরীতে নিয়ন, ক্লেয়ন, জেনন জাতীয় বেশ কিছু নিষ্ক্রিয় গ্যাস বাতাসের সাথে মিশছে আর এই গ্যাসগুলো ক্রমশ বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে দুর্বল করে দিচ্ছে। ফলে ওজোন স্তরের মহাজাগতিক রশ্মিগুলোকে আটকে রাখার ক্ষমতাও কমে যাওয়ার জন্য ত্বকের ক্যানসারও খুব বেড়ে যাচ্ছে।

এ তো গেল পরিবেশের কথা—কিন্তু তোমরা কি জান, আমাদের জীবনযাত্রার অদ্ভুত সব রীতিনীতি ক্যানসার রোগের আর এক আসামী? কাশ্মীরে যখন খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়ে ওখানকার গরীব মানুষেরা তাদের ঢোলা শোয়েটারের নিচে পেটের ঠিক ওপরে কয়লার একটা জ্বলন্ত পাত্র নিয়ে রাস্তায় বেরোয়। ওদের দেশে এগুলোর নাম কাংড়ি। কাংড়ির তাপ ও ধোঁয়ার ফলে তাদের পেটের ওপরের দিকের চামড়ায় ক্যানসার হয়। দক্ষিণ ভারতের মানুষেরা পানের সাথে অতিরিক্ত তামাক ও কলিচুন খাওয়ার জন্য তাদের মুখের ভেতরে ক্যানসার হয়। অন্ধপ্রদেশের উপজাতি শ্রেণীর লোকেরা অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে সিগারেট খান। তাঁরা জ্বলন্ত সিগারেটটা সম্পূর্ণ মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দেন ফলে তাঁদের টাগরায় ক্যানসার হয়। পাটনার আশেপাশের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে খৈনী খাওয়ার জন্য তাদের মুখে খৈনী ক্যানসার হয়। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের ছেলেমেয়েরা খুব কষে ধুতি বা শাড়ী পড়ার জন্য তাদের ধুতি ক্যানসার হয়। যেহেতু আমাদের জীবনযাত্রার সাথেও ক্যানসার ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা যদি তাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন অভ্যাসগুলোকে একটু বদলান তাহলে এই রোগের প্রকোপ কিছুটা কমানো যেতে পারে।

এবার আসা যাক্ ভাইরাসঘটিত ক্যানসার প্রসঙ্গে। ইঁদুরের স্তনের ক্যানসার, লিউকেমিয়া, কুকুর ও বিড়ালের বিভিন্ন ক্যানসারের পেছনে যে ভাইরাসের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে তা পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু মানুষের ক্যানসারে এর কোন ভূমিকা আছে কিনা তা এখনও জানা যায় নি। তবে যেহেতু জীবজন্তু ও মানুষের কোষের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি এক—তাই ভাইরাস থেকে মানুষের ক্যানসার হয় না একথা বলা যায় না। গত এপ্রিল মাসে আমেরিকায় ক্যানসার বিশেষজ্ঞদের এক বিরাট সম্মেলন হয়ে গেল এই সম্মেলনে ক্যানসার বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, জন্ডিসের জন্য দায়ী হেপাটাইটিস

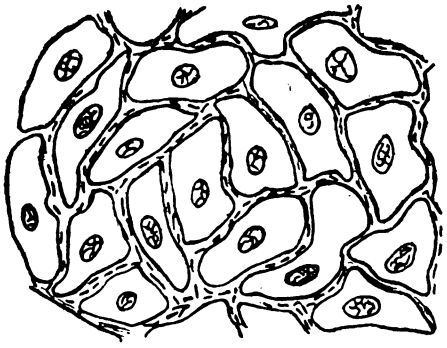

সুস্থকোষ

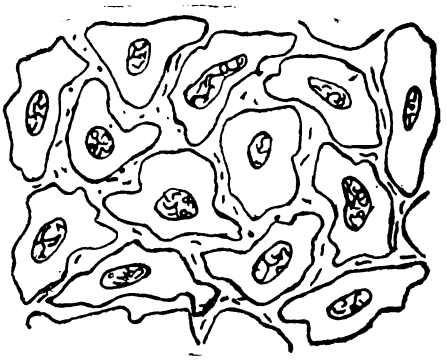

ক্যানসার কোষ

মাইক্রোসকোপে চোখ রাখলেই সুস্থ্য কোষ এবং ক্যানসার কোষের তফাতটা বোঝা যাবে। স্বাভাবিক কোষগুলো একে অপরের সঙ্গে বেশ আঁটোসাটোভাবে লেগে আছে। কিন্তু ক্যানসার কোষগুলোর নিজেদের মধ্যে কেমন যেন ছাড়োছাড়ো ভাব। তবে ক্যানসার কোষের যেটা অন্যতম বৈশিষ্ট তা হলো এরা স্বাভাবিক কোষের তুলনায় অনেক অনেক দ্রুতগতিতে বিভাজন প্রক্রিয়ায় নিজেদের সংখ্যা বাড়ায়।

বি-এপ্টিজেন ভাইরাস—যকৃৎ ক্যানসারের একনম্বর আসামী।

আমরা সবাই একই পরিবেশে বাস করি অথচ কিছু লোক ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হন, বাকিরা দিব্যি এই রোগের হাত থেকে পার পেয়ে যান। তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে কেন এরকম হয়। আসলে কি জানো যারা ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হন তাঁদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারণের চাইতে অনেক কম। আমাদের রক্তে তিনধরনের কণিকা আছে—তার মধ্যে শ্বেতকণিকা নামটার সাথে তোমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। এই শ্বেতকণিকারাই আমাদের দেহের অতন্দ্র প্রহরী। যখন কোন স্বাভাবিক কোষ হঠাৎ বদলে গিয়ে ক্যানসার কোষে পরিণত হয় তখন সেই ক্যানসার কোষটিতে কিছু জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে—কোষগুলোতে তৈরী হয় কিছু নতুন ধরনের প্রোটিন যা স্বাভাবিক কোষে থাকে না। এই প্রোটিনের সূত্র ধরেই শ্বেতকণিকারা খুব সহজেই ক্যানসার কোষগুলোকে সনাক্ত করে ফেলে। তারপর শুরু হয় দুইয়ের লড়াই। এ লড়াই-এ ম্যাক্রোফেজ, k-কোষ, গ্রাসকোষ, প্রভৃতিও অবিরাম শ্বেতকণিকাগুলোকে সাহায্য করে। যেহেতু শ্বেতকণিকারাই ক্যানসারের সাথে লড়াই করার মূল হাতিয়ার, কোনকারণে যদি শ্বেতকণিকাদের কার্যক্ষমতা কমে যায় তবে কিন্তু এ রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া ভারী মুস্কিল। যাদের দেহে কিডনী সংস্থাপন করা হয় তাদের শরীরের মধ্যে বাইরে থেকে ওষুধ প্রয়োগে শ্বেতকণিকার কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেওয়া হয় নতুবা কিডনীটাকেও শরীর শত্রু ভাবে। ফলে দেখা গেছে, এইসব ক্ষেত্রে ক্যানসারও হয় খুব বেশি। অনেকে আবার জন্ম থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে শ্বেতকণিকা না থাকার দরুন Lymphoblastoma জাতীয় রোগে ভোগে। তারাও ক্যানসার রোগের অন্যতম শিকার। কোন কোন সময়ে শ্বেতকণিকারা ক্যানসার কোষের বৃদ্ধির হারের সাথে পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠে না। ক্যানসার কোষগুলোকে ঠিক ঠিক চিনে নিয়ে তাদের আক্রমণ করতে শ্বেতকণিকাদের একটু সময় লাগে। যদি এই অল্প সময়ের অবসরে ক্যানসার কোষটি খুব দ্রুতহারে বিভাজিত হয় শ্বেতকণিকারা আক্রমণ চালিয়েও সবকটি কোষকে মারতে পারে না। কিছু কোষ থেকেই যায়—তারা আবার বিভাজিত হয় ও কোষগুলো থেকে এমন

ক্যানসারের বিপদ সংকেত

(১) মুখে, জিভে বা ঠোঁটে দীর্ঘদিন ধরে এমন ঘা যা সাধারণ চিকিৎসায় সারছে না।

(২) গলার স্বর—দীর্ঘদিন ধরে ভাঙা, সাথে ভয়ানক কাশি।

(৩) খাবার খেতে অসুবিধে ও জমে গণ্ডগোল।

(৪) শরীরের যে কোন জায়গায় বেদনাবিহীন মাংস-পিণ্ডের উপস্থিতি।

(৫) তিল, আঁচিল অথবা জন্মদাগের রং বা আকারের পরিবর্তন।

(৬) শরীরের যে কোন প্রাকৃতিক ছিদ্র পথে অস্বাভাবিক রক্তপাত।

(৭) প্রস্রাব বা মলত্যাগে কোন অস্বাভাবিক পরিবর্তন।

এর যে কোনও একটা ঘটলেই সোজা কোনও বড় হাসপাতালের ক্যানসার বিভাগে যোগাযোগ করতে হবে।

কিছু কিছু এনজাইম বের হয় যা শ্বেতকণিকার কার্যক্ষমতাই কমিয়ে দেয়।

পশ্চিমী দেশগুলোতে ক্যানসার রোগীর সংখ্যা আমাদের দেশের চাইতে অনেকাংশে বেশি। ওদেশের মানুষেরা খুব কম সময় রান্নাঘরে কাটান। তাঁরা বেশি ব্যবহার করেন টিনজাত খাবার। খাবার-দাবার টিনের কৌটোয় সংরক্ষণের জন্য নাইট্রোজ্যামাইন্‌স্‌ জাতীয় কিছু রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় যারা ক্যানসার রোগ সৃষ্টি করে। এছাড়া সংরক্ষিত খাবারে তো খুব স্বাভাবিকভাবেই ভিটামিন কমে যায়। আমরা ওদেশের তুলনায় অনেক বেশি টাটকা ফলমূল, শাকসব্জী খাই কিন্তু আমাদের মধ্যেও এ রোগের প্রকোপ কিছু কম নয়। টাট্‌কা শাক-সব্জীতে ভিটামিন প্রচুর কিন্তু আমাদের রান্নাগুণে তা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আমাদের শরীর প্রয়োজনের ন্যূনতম প্রোটিনও পায় না। তাই দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও অনেক কমে যায়।

আরও কিছু কারণে আমাদের দেশে এ রোগের আক্রমণ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশের মানুষদের মধ্যে ধূমপানের মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে বেড়ে চলেছে ফুসফুসের ক্যানসার—এ নিয়ে বহু কাজকর্মও করেছেন ক্যানসার বিশেষজ্ঞরা এবং তাঁরা বলছেন, ধূমপানের সাথে ক্যানসার রোগের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আর মাত্রাতিরিক্ত মদ বা অ্যালকোহল খাওয়ার জন্য লিভার ক্যানসারের প্রকোপও বেড়ে চলেছে।

স্বাভাবিকভাবেই তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—ক্যানসার রোগের প্রকোপ কমাবার জন্য আমরা কি কোন সাবধানতা অবলম্বন করতে পারি না? প্রথমেই এরজন্য আমাদের দরকার একটা সুষম খাদ্যতালিকা তৈরী করা—যা নিয়মিত খেলে আমাদের প্রত্যেকের দেহেই একটা স্বাভাবিক ক্যানসার রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠবে। ক্যানসার এড়াতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন B_{17}-এ ভরপুর ফলমূল খাওয়া দরকার। কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই ভিটামিনে ভরপুর ফলমূল খেলে ক্যানসার রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বহুলাংশে বেড়ে যায়—এমনকি প্রাথমিক অবস্থায় থাকলে রোগও সেরে যায়। পালং শাক, মিষ্টি আলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, নানা-ধরনের সিম, আপেল, পেয়ারা, পীচ, কালোজাম, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে B_{17}।

আন্দামানের বিভিন্ন উপজাতি, আফ্রিকার বিভিন্ন উপজাতির লোকেরা B_{17} ভিটামিন সমৃদ্ধ কাঁচা ফলমূল, খাওয়ার জন্য এদের মধ্যে ক্যানসারের প্রকোপ অনেক কম। এছাড়া যদি আমরা জান্তব প্রোটিন খাওয়া কমিয়ে ভেষজ প্রোটিন ও খনিজ লবণ গ্রহণের হার বাড়িয়ে দিতে পারি তাহলেও কিন্তু এ রোগকে কিছুটা এড়ানো সম্ভব। ক্যানসার কোষগুলোতে আলফা-ফিটো-প্রোটিন, PNA এন্টিজেন জাতীয় প্রোটিন তৈরী হয়। এদের মাপার একটা চেষ্টা এখন চলছে। যদি তা সম্ভব হয় তাহলে অনেক

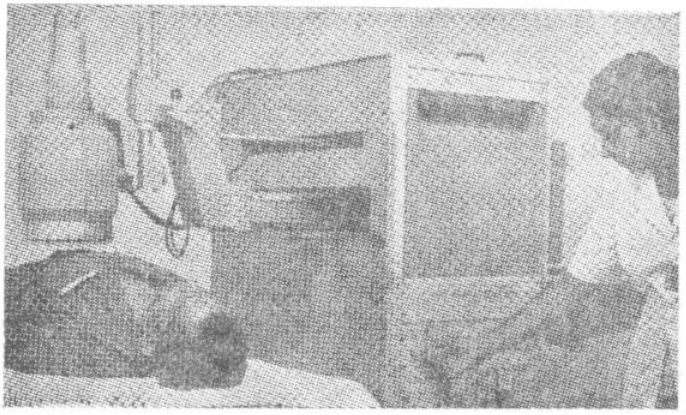

বিভিন্ন হাসপাতালে এখন তেজস্ক্রিয় বিকিরণ (রেডিওথেরাপী)-এর সাহায্যে ক্যানসার রোগীকে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে।

আগে থেকেই আমরা ক্যানসার কোষকে চিনতে পারব। এছাড়া আগ্রাসী কোষগুলির কর্মক্ষমতা যদি আমরা কোন ভাবে বাড়িয়ে দিতে পারি তাহলেও এই রোগ চিকিৎসায় কিছুটা সুরাহা হবে। যেমন যক্ষ্মার টীকা, ভিটামিন A, E ইত্যাদি দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।

সবশেষে একটা প্রশ্ন থেকে যায়—ক্যানসার রোগটা কি বংশগত? কিছু কিছু পরিবারে স্তনের ক্যানসার, মুখের ক্যানসার, পাকস্থলীর ক্যানসার, বৃহদন্ত্রের ক্যানসার বংশপরম্পরায় হতে দেখা গেলেও—ক্যানসার যে বংশগত রোগ একথা কোনও বিজ্ঞানী আজও নিশ্চিত করে বলতে পারেন নি।

স্ফূর্তির অভাবই কি ক্যানসারের কারণ?

শুনতে অবাক লাগছে নিশ্চয়—যে ক্যানসারকে নিয়ে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের মাথাব্যথার অন্ত নেই, সেই ক্যানসারের সূত্রপাত স্ফূর্তির অভাব থেকেই? হ্যাঁ, এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিরাট হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল ১৯৭৮ সালে, বিজ্ঞান-পত্রিকা 'সায়েন্সে' যখন এরকম একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল।

কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়। একই পরিবেশে এত লোক বাস করছে, অথচ বেছে বেছে লোকের ক্যানসার হচ্ছে কেন? এ নিয়ে প্রথম চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয় ১৯৪৬ সালে, ক্যারোলিন বেডেল নামে এক মার্কিন মহিলা মনোবিজ্ঞানী অভীক্ষা চালিয়ে দেখেন যে-সব মেয়েরা ক্যানসারে ভুগছেন, তাঁদের মানসিক গড়নগঠন অনেকটা আত্মহত্যাপ্রবণ রোগিনীদের মতই। এর থেকে বেশী কিছু বেডেল বলতে পারেন নি তখন।

সাতের দশকের গোড়ার দিকে এই নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করেন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী ডাঃ কিসেন। সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে ফুসফুসের ক্যানসারের সম্পর্ক খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখেন হিসেবটা ঠিক মিলছে না। যাঁরা প্রচুর ধূমপান করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ক্যানসারকে এড়িয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন, অথচ এমন অনেক ফুসফুসের ক্যানসার রোগী পাওয়া যাচ্ছে যাঁরা খুব অল্পই ধূমপান

করেন। চলল নানা মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষানিরীক্ষা। ডাঃ কিসেন দেখলেন যাঁরা সবসময়ই মনমরা হয়ে থাকেন, কোন ব্যাপারেই যাঁরা ঠিকমতো উৎসাহ পান না, তাঁরাই কিন্তু বেশী ক্যানসারের শিকার হন—যত কমই সিগারেট তাঁরা খান না কেন।

কিসেনের কাজের সূত্র ধরে পরীক্ষা শুরু করলেন শারীরবিজ্ঞানীরা দেখলেন যাঁরা অল্প ধূমপান করেই ক্যানসারের কবলে পড়ছেন তাঁদের রক্তে একটা বিশেষ এনজাইম 'অ্যারাইল হাইড্রোকার্বন হাইড্রক্সিলেজের' পরিমান স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশী। বিজ্ঞানীরা বললেন, এই এনজাইমের কাজ হচ্ছে সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে যে হাইড্রোকার্বন ফুসফুসে যাচ্ছে, সেই যৌগকে পরিবর্তিত করে ক্যানসার সৃষ্টিকারী এক নতুন যৌগের জন্ম দেওয়া। আশ্চর্যের কথা, এই এনজাইমের তারতম্য কিন্তু বংশগতির ধারার চেয়ে মস্তিষ্কের বিশেষ ধরনের কোষ থেকে বেরিয়ে আসা বিশেষ হরমোনের সঙ্গে বেশী সম্পর্কযুক্ত। দেখা গেল বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থায় 'মস্তিষ্ক' থেকে ঐ সব হরমোন বেরিয়ে আসার পরিমানে তারতম্য হয়, সেইজন্যে পরিবর্তিত হয় রক্তের ঐ বিশেষ এনজাইমটি! আশ্চর্যের কথা যাঁরা হতাশা-জনিত রোগে ভোগেন, তাঁদের রক্তে এনজাইমের পরিমাণও বেশী!

শুধু ফুসফুসের ক্যানসারই নয়, রক্তের একধরনের ক্যানসার এবং 'হজকিন্‌ ডিজিজ' বলে আর একধরনের ক্যানসার নিয়ে গবেষণা চালালেন মার্কিনমুলুকে রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডাঃ উইলিয়াম গ্রীন। ডাঃ গ্রীনও দেখালেন—যাঁরা এই রোগে ভুগছেন তাঁদের অতীতেও নানারকম হতাশা, দুঃখ বা নিঃসঙ্গতার ইতিহাস আছে। একইরকম তথ্য পেলেন লন্ডনের কিং কলেজ হাসপাতালের ধাত্রীবিদ্যার গবেষক ডাঃ গির ও ডাঃ মরিস। তাঁরা দেখলেন যে সব মেয়েরা বেশী হাসিখুশী মনের ভাব চটপট প্রকাশ করে ফেলে, তাঁদের মধ্যে ক্যানসারের ঘটনা অনেক কম!

কিন্তু প্রশ্ন আসতেই পারে—মনমরা হয়ে থাকার সঙ্গে ক্যানসারের সম্পর্ক কি? ১৯৭৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডাঃ বার্নার্ড ফক্স নানা পরীক্ষানিরীক্ষার পর সিদ্ধান্তে এলেন—মস্তিষ্কের মধ্যে 'হাইপোথ্যালামাস' বলে বিশেষ এক জায়গায় হয়ত গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। শরীরের যে বিভিন্ন রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে তার প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হলো 'হাইপোথ্যালামাস'। আবার মানসিক নানা ব্যাপারস্যাপারের সঙ্গেও হাইপোথ্যালামাস ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ডাঃ ফক্সের মতে দীর্ঘদিন ধরে মনমরা হয়ে থাকলে তার সুদূরপ্রসারী ফল হিসেবে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমজোরী হয়ে পড়ে, আর সেই ফাঁকে শরীরে ঢুকে পড়ে ক্যানসার সৃষ্টির নানা 'এজেন্টরা'! অবশ্য ডাঃ ফক্সের যুক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে নানা বিজ্ঞানীর নানা মত আছে।

ক্যানসারের মতো মারাত্মক ব্যাধি, তার মোকাবিলার নিশ্চিত কোন অস্ত্র যখন আমাদের হাতে নেই, তখন যদি মনের স্ফূর্তিতে কোন প্রতিরোধের কাজ হয়, তাহলে হাসিখুসী থাকতে দোষ কি?

With Compliments from :

G. K. ENGINEERS

Contractors & General Order Suppliers

5, Mohendra Chatterjee Lane,

Calcutta-700046

প্রাণদায়ী শৈবাল

অমিয়াংশু চট্টোপাধ্যায়

জলজ উদ্ভিদ শৈবাল বা শ্যাওলাদের সাধারণত লোকে খুব একটা ভাল চোখে দেখে না। কারণটা বোধহয় এই যে উদ্ভিদকুলে জাতপাতের মাপকাঠিতে ওদের তেমন কৌলীন্য নেই, তাছাড়া মানুষের কি কাজেই বা লাগে ওরা? বরং পারলে একটু আধটু ক্ষতি যে করে না তাও তো নয়। যেমন ধরো পুকুরের জল নোংরা করা, তারপরে ধরো ঘাটের সিঁড়িটা শ্যাওলা জমে পেছল হয়ে আছে। তুমি তাড়া-হুড়ো করে স্নান করতে নামছো। যেমনি পা দিয়েছো—একেবারে ধপাস্! কপাল মন্দ থাকলে হাড়গোড়ও ভাঙতে পারে। সুতরাং তোমরা যদি রাগ করে বলো, "প্রাণঘাতী শ্যাওলা"—আমার কৈফিয়ৎ দেবার কিছু নেই। তবে শুধু নিরপেক্ষ ভাবে গোটাকয়েক তথ্য তোমাদের সামনে পেশ করতে পারি। তারপর শেষ বিচারের ভার তোমাদেরই রইল।

শ্যাওলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রোটীন, চর্বিজাতীয় জিনিষ, খনিজ লবণ ও ভিটামিন, বিশেষ করে ভিটামিন A, B, C ও E থাকায় মাছ, পশু পাখী এমন কি সরাসরি মানুষের খাদ্য হিসেবেও আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানারকমের শ্যাওলার চাষ করা হচ্ছে। শ্যাওলা চাষের আর একটা কারণ হল এদের শিল্পগত উপযোগিতা। বিভিন্ন ধরনের শ্যাওলা থেকে Algin, Agaragar, পটাশ ইত্যাদি নানারকম মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যেতে পারে। শ্যাওলার তৃতীয় উপকারিতা হল ভেষজ হিসেবে—নানা আধিব্যাধির চিকিৎসায় এদের ব্যবহার। Laminaria, Codium ইত্যাদি কতকগুলো সামুদ্রিক শ্যাওলায় প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন থাকে বলে গলগণ্ড জাতীয় থাইরয়েড রোগের চিকিৎসায় এই শ্যাওলা থেকে পাওয়া ওষুধ অথবা সরাসরি এই শৈবাল চূর্ণ খাইয়ে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। সাগরজলে যে পরিমাণ আয়োডিন থাকে তার প্রায় বিশ হাজার গুন বেশী আয়োডিন থাকে এইসব সামুদ্রিক শ্যাওলায়! দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরা তো আয়োডিনের অভাবজনিত গলগণ্ড রোগের প্রতিষেধক হিসেবে এইসব শ্যাওলা থেকে তৈরী আয়ুর্বেদিক দাওয়াই "Palcoto" খায় নিয়মিত ভাবে।

Gelidium, Gracilaria ধরনের কতকগুলো লাল সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে Agaragar বলে একটা অত্যন্ত মূল্যবান জিনিষ তৈরী হয়। এই Agaragar জেলি জাতীয় খাবার-দাবার ও প্রসাধনী সামগ্রী তৈরীতে খুব দরকার হয়। তবে এর সবথেকে বেশী ব্যবহার হ'ল হাসপাতাল ও ল্যাবরেটরীতে ছত্রাক বা Bacteria, ধরনের নানারকম জীবানুর culture ও tissue culture-এর মাধ্যম হিসেবে। খুব দরকারী জিনিষ এটা। এছাড়াও কতকগুলো বিশেষ রোগের চিকিৎসায় agaragar ব্যবহারের প্রচলন আছে। যেমন ধরো পাকস্থলীটা চুপ্‌সে গেছে অথবা এর সামান্য স্থানচ্যুতি হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুরা রোগীকে প্রথমে Agaragar মিশ্রিত খাবার খেতে দেন পেট ভরে। তারপর তাকে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে বলা হয়। এই জলপানের ফলে শুকনো Agaragar যেগুলো পেটে গেছে সেগুলো জলশোষণ করে এত বেশী ফুলে ওঠে যে তার চাপে পাকস্থলী আবার তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়। এছাড়াও ওষুধের পিল্, মলম বা ointment তৈরী, কোষ্ঠ

শুন্ধির জন্যে Laxative জাতীয় ওষুধ তৈরীতে এবং ভেষজ শিল্পের আরো অনেক কাজে Agaragar-এর খুব ব্যবহার হয়।

কিছু কিছু শ্যাওলার দেহ থেকে কয়েক রকমের antibiotic বা জীবাণু প্রতিরোধী পদার্থ নিঃসৃত হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় অনেক রকমের bacteria ধ্বংস হয় এবং অন্যান্য শ্যাওলার বিস্তার রোধ হয়। যেমন ধরো Chlorella বলে এক ধরণের এককোষী সবুজ শ্যাওলা থেকে Chlorellin বলে এক ধরণের antibiotic তৈরী হয়। Cladophora ও Lyngbia নামক শ্যাওলা থেকে ভাইরাস বিধ্বংসী এক রকম antibiotic পাওয়া যায়। ভাইরাস ছাড়াও এই antibiotic এর Pseudomonas, Mycobacterium ইত্যাদি কয়েক রকমের ব্যাকটিরিয়াকেও ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে। এইসব শৈবালজাত antibiotic নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে আজকাল। Chara এবং Nitella নামে দুরকম শ্যাওলা খাল বিল পুকুরের জলের নীচে হামেশাই জন্মায়। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে যেখানে এই শ্যাওলাগুলো জন্মায় তার কাছাকাছি জলের ওপর মশা জন্মায় না। খুব সম্ভবত এই শ্যাওলাগুলো থেকে একরকম কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ বেরিয়ে আসে যার মশা এবং অন্যান্য কীটের ডিম বা শূককীট বিনষ্ট করার ক্ষমতা আছে। এ ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে প্রচুর, কারণ বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বুঝতেই পারছো। D, D. T. জাতীয় কীটনাশক ওষুধে এখন আর মশা মারা যাচ্ছে না। এই ওষুধগুলোর বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলেছে তারা। কাজেই Chara জাতীয় শ্যাওলার চাষের মাধ্যমে যদি জৈব নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে মশা নিবারণ করা যায় তা হলে তা হবে বিংশ শতাব্দীর চমকপ্রদ ঘটনা সন্দেহ নেই। এর ফলে মশাও ধ্বংস হবে অথচ রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগের অনিবার্য ফল হিসেবে পরিবেশ দূষণ হবে না।

Digenia, Codium, Alsidium ইত্যাদি কতকগুলো শ্যাওলার নির্য্যাস কৃমিনাশক হিসেবে বেশ ভাল ফল দেয়। প্রাচ্যদেশীয় ইউনানি ডাক্তাররা Kidney, মূত্রাশয় এবং ফুসফুসের পীড়ায় নানারকম শৈবালজাত ওষুধ সাফলের সঙ্গে ব্যবহার করে আসছেন বহুদিন থেকেই।

কতকগুলো সামুদ্রিক শ্যাওলা, বিশেষ করে chondrus crispus (বা Irish Moss) নামের লাল শ্যাওলা থেকে Carrageenin বলে একটা হড়হড়ে পদার্থ পাওয়া যায়। রক্ত তঞ্চন করাতে বা রক্ত জমাট বাঁধাতে এই Carrageenin-এর যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। কাশির ওষুধ হিসেবে এবং দাঁতের মাজন তৈরীতেও এই জিনিসটা ব্যবহার হয়। আবার Ascophyllum, Laminaria জাতীয় কতকগুলো শ্যাওলা থেকে নিষ্কাষিত Alginic acid রক্তপড়া বন্ধ করে। এই Laminaria ধাত্রীবিদ্যায়ও সুনামের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

Vitamin A ও D সমৃদ্ধ Cod-liver কিম্বা Halibot oil ইত্যাদি তেলগুলো আসলে আসে কোত্থেকে জানো? এই সামুদ্রিক মাছগুলো Diatom জাতীয় এক ধরনের অতিক্ষুদ্র এককোষী শ্যাওলা খায়। এই তেলটা আসলে ঐ diatom-এর দেহের মধ্যেই সঞ্চিত থাকে। সেটাই পরে এই প্রাণীদের লিভারে গিয়ে জমা হয়। আর সেখান থেকে মানুষ এই তেল আহরণ করে। ব্যাঙাচির মত লেজ বিশিষ্ট শ্যাওলা Euglenaর সাহায্যে রক্তাল্পতায় ভুগছে এমন কোন রোগীর রক্তে Vit B_{12}-এর অভাব আছে কিনা সহজেই বলে দেওয়া যায়।

সাধারণ মানুষের ধারণা শ্যাওলা শুধু জল দূষিত করে—জলাধারগুলোকে নষ্ট করে ফেলাই এদের কাজ। কিন্তু না, এ ধারণা ভুল। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আংশিক সত্যি হলেও তা সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। নর্দমার পূতিগন্ধময় দূষিত জলকে সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত করতে পারে এমন অনেক শ্যাওলার সন্ধান পাওয়া গেছে।

শেষ করার আগে বলি, অদূর ভবিষ্যতে মহাকাশ অভিযানে শ্যাওলাই হবে মানুষের নিত্যসঙ্গী, বহুদিন ধরে মহাকাশ পরিক্রমার সময় মহাকাশচারীদের নিঃশ্বাসের Co_2 ও মলমূত্র দূরীকরণ, মহাকাশচারীদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য এবং অক্সিজেনের যোগান দেবে একমাত্র chlorella এবং synechococcus জাতের শ্যাওলারাই।

সে আসছে!

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

[**আগে যা ঘটেছে :** ডাঃ মালহোত্রা বেশী রাতে চেম্বার থেকে বেরিয়েছিলেন গাড়ী নিয়ে। পেছনের সীটে লুকিয়েছিল 'সে'। মাঝ রাস্তায় রিভলবার দেখিয়ে পার্সটা দিতে বলল। অতর্কিত আঘাতে তাকে কাবু করে থানায় গাড়ি ঢুকিয়ে দিলেন তিনি। থানার সাব ইন্‌স্‌পেক্টরকে দেখাতে গিয়েই তিনি অবাক। গাড়িতে বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক! বৃদ্ধ বললেন তিনিই ডাঃ মালহোত্রা এবং এই ভদ্রলোক তাঁর পার্স ছিনিয়ে নিয়েছে। সেটা ফেরৎ নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। একটা বড় বাড়ির সামনে এসে যখন দাঁড়ালেন তখন তাঁর চেহারা আবার সেই যুবকের। সেই বাড়িতে উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করছিল ডঃ হিমানীশ সান্যাল আর ডাক্তার পরিতোষ পাইন। 'সে' বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। আলোচনা করে দুজনেই সিদ্ধান্ত নিন, 'সে' এবার মরবে, তাকে মরতে হবে।]

দুই

আবার তাকে দেখা গেল দিন দশেক পরে!

দক্ষিণ কলকাতার একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্টে 'সে' তখন এক কাপ চা নিয়ে বসে আছে। চায়ের কাপ সামনে ধরাই আছে, তাতে চুমুক দেবার জন্যে বিশেষ উৎসাহী তাকে মনে হচ্ছে না। তার চোখ সামনের একটি জুয়েলারি দোকানের দিকে আটকে রয়েছে, যে কোন কেউ তার দিকে তাকালেই এ কথা বলে দিতে পারবে।

আজ আর তার গায়ে সোয়েটার নেই, আছে হালকা রঙের একটা সুট। চুলগুলো বেশ যত্ন করে পাট করা। সেগুলো নিগ্রোর মত কোঁচকানো মোটেই নয়, একটু যেন ঢেউ খেলানো। চেহারায় বেশ যেন একটা আভিজাত্যের ছাপ ফুটে উঠেছে। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যেই মনে হয়।

আলতো করে চায়ের কাপে একবার মুখ ঠেকালো সে। চোখে মুখে একটা বিরক্তির আভাস ফুটে উঠল। বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করছে সে—এতখানি অপেক্ষা করতে হবে যেন সে বুঝতে পারেনি।

জুয়েলারি দোকানে আজকাল সব সময় ভীড় থাকে না। কিন্তু সন্ধ্যা পেরিয়ে এই সময়টা সাধারণত খদ্দেররা একটু বেশী পরিমাণেই আসে, কয়েকদিন পর পর এই অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করে বুঝে ফেলেছে সে। আরেকবার মুখ ছুঁইয়ে চায়ের কাপটা প্রায় শেষ করে ফেলল। একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছে, বোঝাই যাচ্ছিল। টেবিলের তলায় অস্বস্তিতে পা ঘষছিল সে, নীচের দাঁত দিয়ে ওপরের ঠোঁট কামড়ে ধরছিল। কাপটা শেষ করে আজকের মত উঠে পড়বে কিনা সেই কথাই ভাবছিল বোধহয়, এমন সময়—

ঠিক এই রকম সময়ে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল পুরণো মডেলের একটা হিলম্যান গাড়ি। গাড়ি থেকে যাঁরা

নামলেন তাঁরা যে নেহাৎ সাধারণ ক্রেতা নন, সে তাঁদের চেহারা দেখেই বুঝতে পারা যায়।

ভদ্রলোক এবং ভদ্র মহিলা দুজনকেই মোটামুটি মধ্যবয়সী বলা যায়। ভদ্রলোকের পরণে ধুতি পাঞ্জাবী—একটা দামী শাল আলতো করে কাঁধের ওপর ফেলা। তুলনায় ভদ্রমহিলা একটু মোটাসোটা। এই শীতেও তাঁর গায়ে গরমের কোন পোষাক নেই—শুধুমাত্র একটা সিল্ক টাঙ্গাইল শাড়িতেই তিনি ঘামছেন।

দুজনে দোকানের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়েছে সে। চায়ের দাম মিটিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে দোকানের সামনে।

ভদ্রলোক মালিকের চেনা, ওঁরা ভেতরে ঢুকবার পরই একগাল হেসে ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখে সেকথা বোঝা গেল।

'আসুন স্যার—বসুন বসুন'—দোকানের একটি কর্মচারীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'বসন্তবাবুর অর্ডারি নেকলেসটা নিয়ে এসো তো কেষ্ট!'

'যাক, হয়েছে তাহলে!' মোটাসোটা ভদ্রমহিলা ধপ করে একখানা চেয়ারে নিজেকে গুজে দিয়ে বললেন, 'পরশু যেরকম করে বললেন'—

'হয়ে উঠবেনা ভেবেছিলাম'—মালিক গদগদ হয়ে বললে, 'কিন্তু আপনারা বার বার ফিরে যাবেন—সেই ভেবে শেষ পর্যন্ত'—

বসন্তবাবু ততক্ষণে পকেট থেকে রুপোর সিগারেট কেস বার করেছেন, সেটার ঢাকা খুলতে খুলতে বললেন, 'পালিশ করতে হবে বলে আবার দুদিন কাটিয়ে দেবেন নাতো?'

'না না, সেকথা বলবো কেন—বিকেলেই জিনিসটা পালিশ করতে দিয়ে দিয়েছি'—কেষ্ট এসে গিয়েছিল, তার হাত থেকে বাক্সটা টেনে নিয়ে বললে, 'দেখুন না কিরকম খুলেছে ডিজাইনটা।'

বাক্স খুলতেই ভারি পাঁচেকের নেকলেসটা একেবারে ঝকঝক করে উঠল। বাইরে থেকে জিনিসটা দেখে ভেতরে ভেতরে উল্লসিত হয়ে উঠল সে। তার পা দুটো মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে চললো সেদিকে।

কিন্তু ভদ্রমহিলার চোখ তখন কুঁচকে গিয়েছে। বিরক্তিটা একটুও চাপা না দিয়ে বলে ফেলেছেন, 'এটার মানে কি হল শুনি?'

জিনিসটা দেখে বসন্তবাবুর মুখে একটা তৃপ্তির ভাব দেখা দিয়েছিল, কিন্তু ভদ্রমহিলার কথা শুনে পরক্ষণেই মুখের ভাব বদলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ফস্ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলেন।

'কেন বলুন তো'—মালিক থতমত খেয়ে ঢোক গিলে বলল, 'মানে যেরকম বলেছিলেন ঠিক সেই রকম তো করেছে!'

'ছাই করেছে!' ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা, সেই সঙ্গে তাঁর হাতের বিশ গাছা চুড়িও ঝন ঝন করে উঠলো। বললেন, 'আমি আপনাকে এই ডিজাইনটা করতে বলেছিলাম?'

'হ্যাঁ, ওইটেই তো আপনি ডিজাইনের বইয়ে দাগ মেরে দিলেন, বললেন'—

'থামুন থামুন—ভদ্রমহিলা চেয়ারে নড়েচড়ে উঠলেন, 'অর্ডারটাতো লিখেছেন—কত নম্বর লেখা আছে একবার দেখুন না। আমার স্পষ্ট মনে আছে এগারো নম্বর লিখেছিলেন।'

কথা বলে ভদ্রমহিলা সমর্থনের জন্যে একবার পাশের চেয়ারে তাকালেন। বসন্তবাবু একটুও দেরী না করে বললেন, 'ঠিকই তো—আপনি তো এগারো নম্বরই লিখেছিলেন।'

'না না, সেকি কথা'—জোর করে মুখে খানিকটা হাসি আনবার চেষ্টা করল মালিক, কিন্তু অর্ডারের খাতা দেখেই তার গোলগাল মুখখানা ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল। অপরাধীর মত মুখ তুলে মুখে একটা বোকা বোকা হাসি এনে বললে, 'এক্সট্রিমলি সরি মিসেস মল্লিক—ভীষণ ভুল হয়ে গিয়েছে। তবে জিনিষটা কিন্তু দাঁড়িয়েছে দারুন!'

'তাতে কি হয়েছে? আমি অর্ডার দেবো একরকম আর আপনি করে দেবেন অন্যরকম?'

'ঠিক!' বসন্তবাবু সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে পা নাচালেন। মুখে কৌতুক না বিরক্তি বোঝা যাচ্ছিল না, বলছিলেন—'দু-চার হাজারের তো ব্যাপার নয় মশাই, পছন্দ না হলে নেওয়া যায়?'

'সে তো ঠিকই'—বাক্সর ডালাটা বন্ধ করে মালিক বলল, 'তবে কিনা ডিজাইনটা তো ভাল, যদি পছন্দ হয়ে যেত—'

'ভেঙ্গে গড়িয়ে দিন না আবার'—মিসেস মল্লিক, মানে

বসন্তবাবুর স্ত্রী বললেন, 'দেরি তো হয়েইছে, না হয় আরো দুদিন হলো !'

'এসব কাজের বানী খুব বেশী, বুঝতেই তো পারেন'—মালিক আমতা আমতা করল, 'আপনাদের কাছে তো আর'—

'ব্যাস ব্যাস, ওতেই হবে—ওসব কাঁদুনি ছাড়ুন তো !' বসন্ত মল্লিক বললেন, 'যা কথা হয়েছে তার থেকে একটি পয়সা বেশী পাবেন না ।'

সে তখন একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ছে। চোখে না পড়ার কথা নয়। মালিক অন্য একটি কর্মচারীর দিকে চেয়ে বললে, 'দেখো না ইনি কি চান'—

'না, আমি এই নেকলেসটাই দেখছিলাম'—গম্ভীর ভরাট গলায় বলল সে, 'যদি ও'দের পছন্দ না হয় তাহলে এটা আমি নিয়ে নিতে পারি ।'

'আপনি নেবেন ?' মালিক যেন হাতে চাঁদ পেল। বসন্তবাবুর দিকে চেয়ে বলল, 'তাহলে আপনাকে ওই এগারো নম্বরের ডিজাইনেই বানিয়ে দেব দুদিন পরে ?'

বসন্তবাবু স্ত্রীর দিকে চাইলেন। ভদ্রমহিলা বললেন, 'দুদিন বলে আবার দশ দিন করবেন না যেন ।'

'না না, পরশুই পেয়ে যাবেন !' নতুন শাঁসালো খদ্দেরের দিকে ফিরে মালিক বলল—'ঠিক আছে, আপনি নিতে পারেন এটা। দামটা কিন্তু একটু বেশী পড়বে—মানে, অর্ডারি মাল তো, যত্ন করে করা। সোনা, পাথর সব আলাদা করে হিসেব টিসেব আপনাকে দেখিয়ে দেব আমি'—

'আপনি বলুন না কত দাম !' কথার মাঝখানেই মালিককে থামিয়ে দিল সে।

'সবশুদ্ধ ষোল হাজার মত পড়বে, সোনা আছে ধরুন পাঁচ ভরি, আর পাথর মোট'—

হাত দেখিয়ে মালিককে থামতে বলে সে পকেটে হাত ভরে বলল, 'চেক দিলে হবে ?'

'চেক ? মানে চেক টেক তো আমরা'—খদ্দের হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়ে মোলায়েম হেসে মালিক বলল, 'পুরনো কাস্টমার হলে অবশ্য কখনো যে নিইনা এমন নয়—তবে আপনি তো প্রথম আমার দোকানে এলেন—'

'বুঝতে পেরেছি'—পকেট থেকে হাত বার করল সে, 'তাহলে বরং এক কাজ করুন, ঠিকানা রেখে যাচ্ছি—কাউকে দিয়ে জিনিষটা আমার বাড়িতেই পাঠিয়ে দেবেন। টাকাটা হাতে হাতেই পেয়ে যাবেন ।'

'ঠিক আছে—আমি সকালেই পাঠিয়ে দেব'—মালিক অর্ডার নেবার একটা স্লিপ ছিঁড়ে এগিয়ে দিল সামনে। পকেট থেকে একটা শেফার্স পেন বার করে লিখতে যাচ্ছিল ঠিকানাটা, হঠাৎ কি মনে করে থমকে দাঁড়াল।

'দামটা কত বললেন ?'

'ষোল হাজার ।'

'তাহলে আর পরে নেবার দরকার হবে না'—হালকা করে হাসল সে, 'টাকাটা আমার সঙ্গেই হবে। এক্ষুনি একটা পেমেণ্ট পেলাম—খেয়াল ছিল না। দিয়ে দিন ওটা ক্যাশমেমো করে ।'

'টাকাটা'—

'গাড়িতে আছে। আপনি কাউকে পাঠিয়ে দিন আমার সঙ্গে, আমি দিয়ে দিচ্ছি ।'—আড়চোখে বাইরে তাকিয়েছিল সে। অপূর্ব সুযোগ, মিনিট খানেক আগেই একটা অ্যামবাসাডর পার্ক করা হয়েছে উল্টো ফুটে। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—'ওই তো গাড়ি, আসুন না ।'

দিন সময় খারাপ। এইভাবে মাল দোকানের বাইরে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। কিন্তু এমন খদ্দের ফসকে যাওয়াও কোন কাজের কথা নয়। মেমো কেটে বাক্সটা হাতে নিয়ে মালিক হাঁক দিল—'বাহাদুর !'

গেট থেকে ছোটখাটো মজবুত চেহারার নেপালী দারোয়ান এগিয়ে এল। কোমরের ছোট ভোজালিতে হাত বুলিয়ে চেয়ে রইল কুৎকুতে চোখে।

'শোন, এই সাহেবের সঙ্গে ওই গাড়িতে যা—টাকাটা নিয়ে'—কথাটা নিজের কানেই কেমন অদ্ভুত লাগল বলে মাঝপথে হঠাৎ থেমে গিয়ে বাক্সটা হাতে নিয়ে উঠে পড়ে বলল, 'আচ্ছা চলুন, আমিও সঙ্গে যাই ।'

দোকানের দরজা ঠেলে রাস্তায় পা দেবার আগেই কি করবে সব ভাবা হয়ে গিয়েছে তার।

পরিকল্পনা মতো নিখুঁতভাবে কাজ শুরু করল সে। প্রথমেই ছিনিয়ে নিল বাক্সটা মালিকের হাত থেকে। বাহাদুর কিছু বুঝবার আগেই ঢুকে পড়তে চাইল চায়ের দোকানের পাশে ছোট্ট গলিতে। কিন্তু তার আগেই বাহাদুর ক্ষিপ্র হস্তে বার করে ফেলেছে ভোজালি। এক মুহূর্ত দেরি না করে সেটা চালিয়ে দিয়েছে তার পেটে। [চলবে]

হাতিয়ার থেকে যন্ত্র

পেশায় বিদ্যুৎ

রেলওয়ে চালু হবার পর যাতায়াতের সুবিধা ঘটে, দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তের সংযোগটা দৃঢ় হয়ে দাঁড়ায়। রেলগাড়ির সুবিধা যে কত, তা ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় বেশি বোঝা গেল। ১৮৫০ থেকে ১৮৬০ সাল এই দশ বছরের মধ্যে আমেরিকায় রেল লাইনের দৈর্ঘ্য ৭৫০০ থেকে দাঁড়ায় ৩০, ০০০ মাইলে। যুক্তরাষ্ট্র U. S. A'র উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম রেললাইন দিয়ে বাঁধা পড়ে। আর তখনই প্রয়োজন হলো, এমন একটা সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থার যা রেলের আগেই খবর নিয়ে ছুটে যাবে! ডাক বিভাগের এই দ্রুত ছুটে চলা রানার হলো টেলিগ্রাফ। টেলিগ্রাফের তারের মাধ্যমে রেল চলাচলের সংবাদ আদান-প্রদান ঘটিয়ে পরিচলন ব্যবস্থাটি ভদ্রস্থ করা হলো।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপ বা আমেরিকার যে কোন ছোট ছেলের ইচ্ছা হলো ইঞ্জিন ড্রাইভার হবে। অথবা রেলগাড়ির গার্ড—লাল নীল আলো দুলিয়ে হুইশিল ফুঁকে ট্রেন চালাবে। আর ১৮৬০ সাল নাগাদ সব ছোটদের ইচ্ছা—তারা বড় হলে হবে টেলিগ্রাফিস্ট! যেমন আজকের ছেলেরা হতে চায় পাইলট বা স্পেসম্যান! এইরকম টেলিগ্রাফিস্ট হবার ইচ্ছা একটি কিশোরের—নাম টমাস আলভা এডিসন। শৈশবের শেষে কিশোর বয়সে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলো। সেই সময়ে এডিসন ট্রেনে কাগজ ফিরি করেন—পোর্ট হার্টন থেকে ডেট্রিয়ট এই হলো সীমানা। যুদ্ধের খবরে লোকেদের উৎসাহ দেখে ট্রেনে এক ছাপাখানা বসিয়ে নিজের ছাপানো কাগজ এডিসন বিক্রি করতে থাকেন। ১৮৬২ সাল, এডিসন তখন পনের-ষোল বছরের কিশোর। সেই সময় শিলোর বিখ্যাত যুদ্ধ ঘটে। এডিসন যুদ্ধের খবরের হেড লাইনটি আগের স্টেশনগুলোতে টেলিগ্রাফ মারফত জানিয়ে দিলেন। তার ফলে স্টেশনে ট্রেন হাজির হলে তার কাগজ কিনতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এডিসনের বিক্রি-বাঁটরা ভালই হলো! আর এডিসন দেখেন টেলিগ্রাফ ভারি কাজের! অতএব ছোট বেলার ইচ্ছাটাকে পেশায় লাগালেন এডিসন। ইউ এস টেলিগ্রাফ কোরে যোগ দিলেন। কানে খাটো এডিসনের কাছে খবর পাঠানো-খবর ধরা কাজটা যুৎসই হলো না। তিনি বরং যন্ত্রপাতির দেখাশুনা করার কাজটা হাতে তুলে নিলেন। ডেট্রিয়ট স্টেট থেকে নিউ অরলিয়েন্স স্টেট—এই সারা অঞ্চল জুড়ে তার যন্ত্রের দেখাশোনা করার কাজ। পাঁচ বছর সেই কাজে থাকলেন তিনি। আর এই সময়ে ১৮৬৪ সালে ইণ্ডিয়ান পোলিস সহরে প্রেস রিপোর্ট রেকর্ড করার একটা যন্ত্র করলেন। যন্ত্রটা উলটো দিকে ঘোরালে যা ধরা হয়েছিল, তাই শোনা যেত। অর্থাৎ গ্রামাফোনের আদি রূপটি এডিসন করলেন। মোর্সের তৈরি করা জটিল টেলিগ্রাফের যন্ত্রে একটা রিপিটার ডিস্ক ছিল। সেখানে যদি কোন দাগ বা টাল থাকতো, তবে ডিস্কের সঙ্গে লাগানো মিডলটা ডিস্কের ঘোরার সময় ঐ জায়গায় একটা কিরকিরে আওয়াজ তুলতো।

কানে খাটো এডিসন ঐ শব্দ শুনে ভাবলেন, মানুষের গলার শব্দও একটা প্লেন সার্ফেসের দাগে ধরা যাবে। ধরা গেলও। তবে এডিসন এই রেকর্ড নিয়ে বেশি মাথা খাটালেন না। তাঁর কাছে টেলিগ্রাফ হলো এমন একটা বস্তু যা নিয়ে অনেক খেলা খেলা যায়। গৃহযুদ্ধের সময় টেলিগ্রাফে যে সব মিলিটারি সংবাদ আদান-প্রদান হতো, তা কিন্তু শত্রুপক্ষের লোকেরা সহজেই জেনে নিতে পারত। যুদ্ধের পর, যুদ্ধের গোয়েন্দা বিভাগের একজনের সঙ্গে এডিসনের আলাপ হয়। তাঁর কথায় এডিসন টেলিগ্রাফের সংবাদ গ্রহণ-প্রেরণের অসুবিধাগুলো দূর করার কাজে লাগেন। সে যুগে টেলিগ্রাফ ছিল ডুপ্লেক্স —একই তারে একসঙ্গে বিপরীত দিকে দুটো সংবাদ পাঠানো যেত। এডিসন আবিষ্কার করলেন, একই দিকে একসঙ্গে দুটো সংবাদ পাঠাবার পদ্ধতি। তারপর পুরোনো পদ্ধতির সঙ্গে নতুন আবিষ্কারটি জুড়ে পেলেন কোয়াড্রুপ্লেক্স সিস্টেম— চারটে সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা হলো একটি তারে। ১৮৭৪ সালে এই পদ্ধতির রীতিমত ব্যবহার শুরু হলো। আর এই আবিষ্কার করার ব্যাপারে নিজের চিন্তাশক্তিকে একমুখী করার গুণটি এডিসনের আয়ত্বে এসে গেল। অন্যদিকে অন্য-বিষয়ে ভুলোমন হয়ে গেলেন। কানে খাটো ভুলোমন লোকটি যে কাজের এতদিনে কিন্তু সবাই তা জেনে গেছে।

১৮৬৮ সালে বোস্টনে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন টেলিগ্রাফিক সার্ভিসে যোগ দিলেন। আর সে বছরই তিনি তাঁর কাজের প্রথম পেটেন্টটি নেন। সেটি হল ভোট গোণার বৈদ্যুতিক যন্ত্র। রাজনীতিবিদরা তাঁর এই যন্ত্রটি লুফে নিলেন। এডিসনের হাতে টাকাও এল। টাকার মুখ দেখে এডিসন ঠিক করলেন, লোকের যা দরকার, যা চায়—সেই যন্ত্র আবিষ্কার করতে হবে। চাহিদা আছে বলে বিক্রিতে অনিশ্চয়তা থাকে না। টাকার দরকার তাঁর। এর কারণ হলো, হিউয়েজ সাহেবের প্রিন্টিং টেলিগ্রাফের আদলে তিনি স্টক এক্সচেঞ্জের দালালদের জন্য একটা প্রিন্টিং মেশিন করলেন। দালালরা সেই মেশিনটা নিল না। এদিকে মেশিন তৈরি করার হ্যাপা সামলাতে এডিসন ধার দেনায় অস্থির।

গৃহযুদ্ধের পর আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা তখন যাচ্ছেতাই রকমের খারাপ। ওয়ালস্ট্রিটের গোলমালের সময় সোনার দাম হু হু করে যখন বাড়ছে কমছে, তখন সেদিনের রেকর্ডিং যন্ত্র যেন সেই গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে থেমে গেল। এডিসন ঘণ্টা দুই খেটে যন্ত্র মেরামতি করলেন। আর সেই সুবাদে ঐ সিস্টেমের জেনারেল ম্যানেজার পদটি পেলেন। মাস মাইনে ৩০০ ডলার।

এরপরে বন্ধু পোপের সঙ্গে এডিসন একটি ফার্ম করলেন —নাম ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। পেশা হিসেবে বিদ্যুতের ঘোষণা সেই প্রথম। এডিসন আর পোপ হলেন প্রথম ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। এই ফার্মের মারফত এডিসন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেন। সব রেকর্ডিং যন্ত্রের সব ডায়েলের সব কাঁটাকে জিরোতে আনা গেল। মেকানিকদের ঘুরে ঘুরে এই কাজ আর করতে হলো না। আর ব্যবসায়ীরা এডিসনের এই আবিষ্কার কিনে নিতে তাকে দিলেন ৪০ হাজার ডলার।

১৮৭০ সাল। এডিসনের বয়স ঊনত্রিশ। ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা তাকে টাকা এনে দিল। অনেক টাকা!

□ মির্জা নৌশাদ

জীবাণুসার

● অ্যাজোটোবেকটার ●

জমির উর্বরতা ও ফলন বাড়ায়, গাছ দ্রুত বাড়ে, ঝাঁকড়া হয় ও সতেজ থাকে, ফুল ও ফলের আকার বড় হয়, দানা পুষ্ট হয়, গাছের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, ছত্রাক-রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়, জমির জল ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ে।

● রাইজোবিয়াম ●

বাদাম, সয়াবীন ও সমস্ত ডালচাষে 'রাইজোবিয়াম' জীবাণুসার ব্যবহার করুন। রাইজোবিয়াম ফলন বাড়ায় এবং পরবর্তী ফসলের জন্য প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন জমিতে সঞ্চিত রাখে।

প্রস্তুতকারক :-নাইট্রোফিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ

(ভারত সরকার অনুমোদিত)

ব্লক ডি, জয়শ্রী পার্ক কলিকাতা-৭০০০৩৪

ফোন : ৭৭-৩৩২৬, ৭৭-১৪৯০

চিড়িয়াখানার মেনু

পুলক চট্টোপাধ্যায়

'সন্দি হয়ে গেল, এখনও কলে জল এল নি, আর পারি না বাপু'—ছানির মা সেদিন বাসন মাজতে মাজতে আপন মনে গজগজ করছিল, মা রান্নাঘর থেকে বলে উঠলেন, 'কি হল গো, আপন মনে কি বলছ ?' ছানির মার গলা এবার সপ্তমে চড়ে, 'আর বোলো নি দিদিমনি, এ্যাই কাজ শেষ করি আবার বাড়ি গে গুষ্টির পিণ্ডি রান্না করতি হবে, এ্যাই মাগ্গি ভাতার দিনে এত বড় সংসারটা চলে যে কি করে ?'

চৈতি বাবার সাথে বারান্দায় বসেছিল। বলে, বাবা গুষ্টির পিণ্ডি কি গো ? বাবা বলেন, ওসব কথায় কান দিতে নেই। মা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে বলেন, মেয়ের কানে ঠিক গেছে তো কথা, উঃ কি মেয়ে বাবা। বাবা বলেন, তা ওর আর কি দোষ ? যে কথা কানে আসে তা তো আর ও না শুনে থাকতে পারে না। মা বলেন, কত বার যে আমি ছানির মাকে বারণ করেছি। চৈতি আবার বলে ওঠে, বল না গুষ্টির পিণ্ডি কি ? মা বলেন তুমি থাম, তোমাকে কতদিন না বলেছি সব কথায়···।

বাবা চৈতিকে বলেন, আমি তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি,—সংসার বড় হলে সবার জন্যে খাবার যোগাড় করাটা খুব শক্ত ব্যাপার তো, তাই ওর মনে দুঃখ হয়েছে। সেই কষ্টের কথাই ও বলছিল। তা যাক গে, আজ আমি তোমাকে এক বিরাট সংসারের গল্প শোনাব।

—মহাভারতের দুর্যোধনদের সংসারের কথা ? চৈতির কথায় বাবা হেসে উঠে বলেন, না না সেতো পুরণো গল্প ! এ একেবারে নতুন, আর এটাকে ঠিক গল্প বলাও যায় না, এই কলকাতাতেই রয়েছে এমন এক সংসার। —কলকাতাতে ?

—হ্যাঁ, কলকাতাতেই, আরও মজার কথা কি জান? এই সংসারে যারা রয়েছে তাদের এক একজনের রুচিও এক একরকমের, এদের রোজকার মেনু শুনবে—গাছপালা, শাক-শব্জী, দানাশষ্য, ধান, চুনী, ভুষি, ফলমূল, মধু, গুড়, খিচুড়ি, পায়েস, পাঁউরুটি, কাঁচা ডিম, সেদ্ধ ডিম, পিঁপড়ের ডিম, পোকামাকড় থেকে শুরু করে মাছ, মাংস, কাঁকড়া, সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, আরশোলা এমন কি পাথরের কুচি, ঝিনুকের খোলা কিছুই এদের মেনু থেকে বাদ যায় না!—কাদের মেনুর কথা বোলছো গো জেঠু? বাবু হাঁফাতে হাঁফাতে এসে জিজ্ঞেস করে। চৈতি বলে, জানিস, বাবা একটা সংসারের গল্প বলছে, যারা কি সব মজার মজার জিনিস খায়! বাবা বলেন, আগেই তো বলেছি এটা গল্প নয়; রোজ প্রায় আশি রকমের খাবার যোগাড় করতে হয় এদের জন্যে। বাবু বলে, 'জেঠু সুকুমার রায়ের সেই ছড়াটা—

'যত কিছু খাওয়া আছে স্বদেশে ও বিদেশে
জড় করি আনি তাহা নয় বড় সোজা সে।'

—হ্যাঁ ঠিক বলেছ, তাই ত দরকার হয় হরিণ ঘাটার দুধের কার্ড, রেশান কার্ড ও ভারতীয় খাদ্য সংস্থার কাছ থেকে ধানের ছাড় পত্রের ব্যবস্থা করার।—তা হলেও এত বিভিন্ন ধরনের খাদ্য রোজ রোজ যোগাড় করে কি করে?—মা এবার জিজ্ঞেস করে উঠেন।—সেই জন্যেই তো বছরের শুরুতেই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ টেণ্ডার ডাকেন সব রকম খাদ্যের জন্য।

—ওঃ, তুমি চিড়িয়াখানার কথা বলছ, বাঃ বাঃ খুব মজার, ওরা কে কি খায় তাও বলতে হবে কিন্তু। চৈতি, বাবু এক সাথে লাফিয়ে উঠে। মা বলেন কাল তো রবিবার, ছুটির দিন, চল না ওদের নিয়ে চিড়িয়াখানায় ঘুরে আসি। পিকাই ও সেদিন এসে যাবার কথা বলছিল,—কি মজা, কি মজা বলতে বলতে চৈতি ছুটে গিয়ে ফোন ধরে পিসিকে ফোন করে। হ্যালো পিসি,···কাল সকালেই পিকাইকে নিয়ে চলে এসো, আমরা সবাই মিলে চিড়িয়াখানায় যাবো। ঠিক ছটার সময় চলে আসবে, দেরী করবে না কিন্তু। ফোনটা ঘটাং করে নামিয়ে রেখে ফিরে এসে বলে, আমি পিকাইদের আসতে বলে দিয়েছি, কাল তাহলে আমরা সবাই যাচ্ছি, তুমি অধীর কাকুকে ফোনে বলে রাখ। —হুঁ, দেখি ওকে আবার পাই কি না? ঠিক আছে, সন্ধে হয়ে গেছে এখন তোমরা পড়তে বোসো।

চৈতি পড়তে পড়তে শুনতে পায় বাবা অধীর কাকুকে বলছেন, কাল সকালে তোমার ওখানে বাচ্ছাদের নিয়ে যাচ্ছি। ব্যাপারটা হল—তোমার ওই বিরাট সংসারে কে কি খায় তা ওরা জানতে চায়, এ ব্যাপারে তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

পরের দিন সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ পিকাইরা এসে পেঁছিলে, সাতটার সময় ওরা সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে চিড়িয়া-খানায় রওনা হয়, ওখানে পেঁছিতেই অধীরকাকু বলেন কি তোমরা সব ভালো আছো তো? চৈতি বলে আমাদের কিন্তু সক্কলের কথা বলতে হবে, কে কি খায়? —ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো তোমাদের ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি। হাঁটতে হাঁটতে ওরা প্রথমেই যে খাঁচাটার কাছে যায় সেখানে একটা জন্তু চেয়ারে বসে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে চোখ বুজে কি যেন ভাবছিল, পিকাই বলে আরে এটা তো শিম্পাজী, ঠিক মানুষের মতো বসে আছে। অধীর কাকু বলেন, ঠিক বলেছ শিম্পাজীরা যে মানুষের খুব কাছের জীব তা প্রমাণ করে এদের খাওয়ার ধরন-ধারণ সকাল হলেই এদের কি প্রয়োজন হয় জান?—চায়ের সঙ্গে টোস্ট আর ডিম সেদ্ধ, খাবার চেয়ার টেবিলে যুত করে খেতে খেতে এক কাপ চায়ে তৃপ্ত না হলে হাত বাড়িয়ে রক্ষকের কাছে আর এক কাপ চায়ের জন্যে অনুরোধ জানায়। বাবু বলে এরা আর কি খায়? —এছাড়া নানা রকমের ফলমূল, লেটুস, কলা, লেবু, খেজুর, আঙুর, পাঁউরুটি দিনে দুবার। জল খেতে ইচ্ছে করলেই নিজের গ্লাসটা এগিয়ে দেয় রক্ষকের কাছে। মা বলেন, হয়তো বলে জল দাও—একটু জল,—সবাই হোঃ-হোঃ করে হেসে উঠে। অধীর কাকু বলেন ঃ আর একটা মজার ব্যাপার হল খাবার আনতে দেখলে এরা যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে তেমনি খাবার আসতে একটু দেরি হলেই চিৎ হয়ে শুয়ে ঘন ঘন কপালে হাত বুলিয়ে হতাশা প্রকাশ করে।

—ওরে বাবা হাতিটা কি বড় রে, দ্যাখ, দ্যাখ কেমন শুঁড়ে করে পয়সা নিয়ে মাহুতকে দিয়ে দিচ্ছে—পিকাই,

বাবু, চৈতি একসঙ্গে হৈ চৈ করে উঠে। বাবা বলেন, হাতির খাওয়ার পরিমাণ তো এক বিরাট ব্যাপার। পিসি বলেন, সে আর বলতে! কথাতেই তো আছে 'হাতির খোরাক'। অধীর কাকু এবার বলেন,—শুধু হাতিকে দোষ দিচ্ছেন কেন? জলহস্তীও কম যায় না।—ওরা কি খায়? মার প্রশ্নের উত্তরে কাকু বলেন, সাধারণতঃ স্তন্যপায়ী তৃণভোজী প্রাণীদের খাবার মেনু প্রায় একই রকমের ঃ ঘাস, বিচুলি, গুড়, ভূষি, ছোলা, খোল ইত্যাদি। তবে খাবার পরিমাণ নির্ভর করে দেহের ওজনের উপর। সঙ্গত কারণেই হাতি ও জলহস্তীর খাদ্যের পরিমাণ হয় সবচেয়ে বেশী, ঘাস, বিচুলি, পাতা, ধান, হাতে গড়া বড় বড় সাইজের রুটি, খিচুরি, আখ, কলাগাছ, ভিজানো ছোলা, ভূষি, গুড়, নুন ইত্যাদি মিলিয়ে একটা হাতিই সারাদিনে খায় প্রায় ৬০/৭০ কে. জি.। মা, বাবা, পিসি সবাই একসঙ্গে বলে উঠেন ঃ খুব সিরিয়াস ব্যাপার তাই না?

চিড়িয়াখানা কাঁপিয়ে সিংহের ডাক কানে আসতেই পিকাই একটু থতমত খেয়ে যায়। চৈতি ওকে সাহস দেবার জন্যে বলে, দূর ভয় পাচ্ছিস কেন, ওর বোধহয় ক্ষিদে পেয়েছে তাই ডাকছে। অধীর কাকু বলেন, ঠিক হল না, আসলে ওকে খাবার দেওয়া হয়েছে তাই হাঁক ডাক করে সবাইকে সরে যেতে বলছে। —মানে? বাবার প্রশ্নের উত্তরে কাকু বলেন, খাওয়ার ব্যাপারে এইসব মাংসাশী জীবেরা ভীষণ স্বার্থপর, তখন সঙ্গীদের সঙ্গেও কোন খাতির নেই। বাবু বলে বাঘ, সিংহ কাঁচা মাংস খায় তাই না? —হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, সাধারণতঃ মাংসাশী স্তন্যপায়ী জীব—যেমন বাঘ, সিংহ, হায়না, চিতাদের খাবার প্রকরণ ও পদ্ধতি মোটামুটি এক। এদেরকে দিনে একবার মাংস খেতে দেওয়া হয় আর সপ্তাহে একদিন উপোষ! খাওয়ার পরিমাণের কথা জানতে চাইতে কাকু বলেন—দেহের ওজনের উপর নির্ভর করে এরা এক একজনে রোজ প্রায় ১২-১৪ কে. জি. মাংস খায়। চৈতি জিজ্ঞেস করে, এরা অসুখ করলে ওষুধ খায়? —নিশ্চয়ই, অসুখ করলে তো বটেই তাছাড়া মাঝে মাঝেই খাবারের সঙ্গে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম ও ক্রিমিনাশক ওষুধ দেওয়া হয়। পিকাই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে —কি সুন্দর, কি সুন্দর, দ্যাখ দ্যাখ কি সুন্দর সিংহের বাচ্চা। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে—কি সুন্দর, কি সুন্দর। মা অধীর কাকুকে জিজ্ঞাসা করেন—এদের আপনারা কি খেতে দেন? —বাচ্চারা প্রথমে মার দুধ খায় পরে এদেরকে মাংসের নির্যাস বা সুপ দেওয়া হয়, আরো পরে মার সঙ্গে থেকে মাংস খাওয়া শেখে। কিন্তু একটা মুশকিল হোলো বাচ্চাগুলো বড় পেটুক, মাঝে মাঝেই এরা এত বেশী খেয়ে ফেলে যে পেটফুলে মরে যায়। তাই এখন ছয় সপ্তাহ বয়সের পরেই মার কাছ থেকে আলাদা করে নিয়ে পরিমিত খাবার দিয়ে এদের বাঁচানোর চেষ্টা চলছে, কারণ অন্ততঃ এক বছর বয়স পর্যন্ত এদের খাওয়া-দাওয়া ও স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

এখানে বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোচ্ছে, চলো আমরা এগোই, পিসির কথায় সবাই হাঁটতে শুরু করে। খাঁচার মধ্যে সাত আট ফুট উঁচু কিম্ভূতাকার একটা পাখিকে দেখিয়ে বাবু জিজ্ঞাসা করে এটা আবার কি পাখি রে? চৈতি বলে, জানিস না বুঝি? এদের বলে উটপাখী। এরা কি খায় গো কাকু? —এরা পাঁউরুটি, ফলমূল, শব্জী ইত্যাদি খেয়ে থাকে। —বাঃ বাঃ পাখীতে পাঁউরুটি খায়, শব্জী খায়, ভারী মজা তো! চৈতি, বাবু পিকাই একসাথে বলে উঠে। তোমরা ঠিকই বলেছ পাখিদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা সত্যিই বিচিত্র, কারণ পাখীর প্রজাতির সংখ্যাও অনেক আর তাদের ঠোঁটের গঠনও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন মাংস আহারী পাখী পেলিক্যান, পানকৌরি, ওয়াক্ ওয়াক্, হাড়গিলা—এদের সাধারণতঃ মাছ দেওয়া হয় যদিও শামুক, ব্যাঙ, ব্যাঙাচি কিছুতেই এদের অরুচি নেই। ধনেশ পাখীর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, এরা পতঙ্গভুক, কিন্তু চিড়িয়াখানায় ওরা খেয়ে থাকে কলা ও ছাতুর সঙ্গে মাংসের কিমা।

—দেখো দেখো কাকাতুয়াটিকে কে সুন্দর দেখতে—মার কথায় এবার সবাই কাকাতুয়ার সামনে এসে ভিড় করে। ধবধবে সাদা গায়ের পালক মাথায় বিরাট ঝুঁটি, চালচলনের আভিজাত্যে সবাই মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখতে থাকে। পিসি জিজ্ঞেস করে এদের আপনারা কি খেতে দেন? —একটু ভাল করে এই ম্যাকাও বা কাকাতুয়ার ঠোঁটের বৈচিত্র্যটা লক্ষ্য করুন, কেমন

বাঁকানো শক্ত ঠোঁট না ? এই ধরনের শক্ত ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খাওয়া সম্ভব নয় বলে এদের বরাদ্দ আস্ত চিনে বাদাম, ছোলা, আখরোট, আখ ইত্যাদি। পিকাই কখন যে এগিয়ে গিয়েছিলো কেউ খেয়াল করে নি,—সে চেঁচিয়ে বলে এই পাখীটা কি সুন্দর দেখতে, এটার নাম কি গো ? সবাই পাখীটার কাছে এগিয়ে গেলে অধীর কাকু বলেন এটা হল বার্মিজ ময়ূর। চৈতি হঠাৎ বলে উঠে, এ মা এটাকে খাবারের সাথে এত পাথর কুঁচি দিয়েছ কেন ? তোমরা বুঝি একে পাথর খাইয়ে পেট ভরাও ? কাকু হেসে বলেন না, না, তা কেন, —আমরা অন্য খাবারের সাথে পাথর কুঁচি দিয়ে থাকি যাতে হজমটা ভাল হয়। বাবু বলে,—পাথর আবার হজম হয় নাকি ?—না, না পাথর হজম হবে কেন, ওগুলো অন্য খাবারের সঙ্গে পাকস্থলীতে গিয়ে পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের সাহায্যে খাবারগুলোকে গুঁড়ো করে হজমে সাহায্য করে। চৈতি, পিকাই, বাবু এর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কাকু বলেন তোমরা খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ না ? আচ্ছা জলের আর এক নাম জীবন, এটা তো ঠিক ? কিন্তু এমন পাখী আছে যাদের জলের প্রয়োজন হয় না, নাম ট্রাগোপ্যান, হিমালয় অঞ্চলের পাখী।

বাবা বলেন, তা ট্রাগোপ্যানের জলের প্রয়োজন না থাকলেও আমাদের জলের প্রয়োজন আছে। অনেকক্ষণ ঘোরা হয়েছে, চল এবার একটু জলটল খাওয়া যাক। একটু এগিয়ে গিয়ে ওরা মাঠের মধ্যে সতরঞ্জী বিছিয়ে বসে পড়ে। গল্প করতে করতে ওরা যখন খাওয়া-দাওয়া করছিল তখন ঢিলে-ঢালা পোশাক পরা, উস্কোখুস্কো চুল এক ভদ্রলোক অধীর কাকুকে নমস্কার জানিয়ে বলেন, কি ভাল আছেন তো ? কাকু সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন—মিঃ ঘোষাল, জীব জন্তু, এবং বাচ্চা ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত ভালবাসেন, প্রায় প্রত্যেক রবিবারই ওনাকে এখানে দেখতে পাওয়া যায়। পিকাই ঝালমুড়ি খেয়ে খানিকটা যত্ন করে মুড়ে রেখে দিচ্ছিল। মিঃ ঘোষাল ব্যাপারটা দেখে পিকাইকে জিজ্ঞেস করলেন, ওটা কি ভবিষ্যতের সঞ্চয় ?

পিকাই বলে, না এটা ঐ ওদের খাওয়াবো। বলে হরিণের খাঁচার দিকে হাত তুলে দেখায়। মিঃ ঘোষাল বললেন, দেখো তোমরা অনেকে নানা রকম জিনিষ ওদের ভালোবেসে খাওয়াও বটে ; কিন্তু তাতে ওদের খারাপই হয়। সবার তো সব রকম খাবার খাওয়ার কথা নয় ; তাই তারা এসব খেয়ে সহজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর এভাবে অসুস্থ হয়ে তারা যদি মরে যায় তাহলে আর তোমরা কাদের দেখতে এখানে আসবে। কথা শেষ করেই মিঃ ঘোষাল হন্ হন্ করে হেঁটে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যান। অধীর কাকু বলেন ওনার সংসার বলে কিছু নেই, তাই সব ভালবাসাটুকুই পেয়ে থাকে চিড়িয়া-খানার এই পশুপাখীরা আর ছোট ছোট বাচ্ছারা। দর্শকদের পশুপাখীদের খাবার দেওয়া বা কোনরকম অত্যাচার ওঁকে ভীষণ কষ্ট দেয়।

—দূরে ঐ বাড়িটা কিসের ? পিসির কথার জবাবে কাকু বলেন, ওটা সরীসৃপ ভবন। ওখানে সাপ, কুমীর রাখা আছে। বাবা বলেন বেলা পড়ে এল, চল আমরা দেখা শেষ করি। সবাই ধীর পায়ে সরীসৃপ ভবনের দিকে এগিয়ে যায়—কাকু বলেন, বিজ্ঞানীদের মতে পাখী নাকি এসেছে সরীসৃপ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে। কিন্তু সরীসৃপেরা কখনই পাখীদের মত খাই খাই করে না। সপ্তাহে একদিন মাত্র এরা খাবার খেয়ে থাকে আর বছরে আড়াই থেকে তিন মাস শীতে যখন হীমশয়নে যায় তখন খাবারের কোন প্রয়োজনই হয় না। —ওরে বাবা এটা গাছের গুঁড়ি না কি রে ? এটা কি সাপ বলত ? বাবুকে থামিয়ে দিয়ে চৈতি বলে কেন দেখতে পাচ্ছিস না বুঝি লেখা রয়েছে Python, যাকে বলে ময়াল সাপ। বাবু আবার বলে, এতবড় সাপটা কি খায় বল তো ? —এখানে এদের দেওয়া হয় জ্যান্ত মুরগী। কাকুর কথায় সবাই চমকে উঠে, —হ্যাঁ ! জ্যান্ত মুরগীকে শরীরের পাকে মাংসের পিণ্ডে পরিণত করে আস্তে আস্তে গিলে ফেলে। আর ওই পাশের সাপটাকে দেখো, এদের বলে চন্দ্রবোড়া ; এই চন্দ্রবোড়া আর বালিবোড়া খায় মুনিয়া পাখী। চৈতি জিজ্ঞেস করে, সাপেরা পাখী খেতে খুব ভালবাসে বুঝি ? —না না সব সাপই পাখী খায় না। যেমন—গোখরো, কেউটে খায় ব্যাঙ, কালনাগিনী টিকটিকি, তক্ষক আরশোলা। তবে একটা কথা আছে না, কাক কাকের মাংস খায় না, সাপ কিন্তু সাপের মাংস খায়,—ওরে বাবা কি বড় ফণা রে, কত-

খানি উঁচু হয়ে ফণা তুলেছে—পিকাই একটা সাপের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাকু বলেন, এর নাম শঙ্খচূড়, মজা হল এরা নিজেরা সাপ হলেও অন্য সাপই এদের খাদ্য। শাঁখামুটিও তাই, সাপ খেয়েই বেঁচে থাকে। চৈতি রেলিঙে ভর দিয়ে চৌবাচ্ছার দিকে তাকিয়ে বলে, আরে আরে এখানে কুমীর রয়েছে দেখে যাও। সবাই সেদিকে এগোলে কাকু বলেন, কুমীররাও সাপেদের মতই সপ্তাহে একদিন খায়। বাবা জিজ্ঞেস করেন, এদের কি দেওয়া হয়? এরা সাধারণতঃ গরুর মাংসই পেয়ে থাকে তবে মেছো কুমীরেরা অবশ্য মাছই খায়। সরীসৃপ ভবন থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাবা হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, তোমাদের এখানে যে সব বিদেশী পাখীরা আসে তাদের ত দেখলাম না!—না তাদের এখন দেখতে পাবে না, ওরা নভেম্বর নাগাদ আসে আবার মার্চের মধ্যেই চলে যায়। ঐ সময় এলে তোমরা দেখতে দশ পনের হাজার পাখী চিড়িয়াখানার ঝিলগুলোকে ঢেকে রেখেছে। —তোমরা অত পাখীকে খেতে দাও কি? —আমরা ওদের কিছুই খেতে দিই না, সারাদিন চিড়িয়াখানার ঝিলে থেকে সন্ধে বেলায় ওরা গ্রামের কোন শস্য ক্ষেতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারে, আবার ভোর না হতে হতেই চিড়িয়াখানায় ফিরে আসে। কাকুর কথা শেষ হতেই সবাই বলে উঠে, বা খুব মজার ব্যাপার তো।

বংশী, পিঁপড়ের ডিম এসে গেছে? কলায়ের ডিস্ হাতে সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া একজনকে কাকু প্রশ্ন করেন। —হাঁ! সাব। —আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ওদের দিয়ে দাও। মা বলেন, রাতের বেলাতেও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার চলে নাকি? —না, ঠিক তা নয়, আসলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা দিনে দিনে সারা হলেও নিশাচর প্যাঙ্গোলীনেরা এটা রাতেই সারে। তবে মজার ব্যাপার হল এদের একমাত্র খাদ্য পিঁপড়ের ডিম আর খাওয়ার ধরণটাও বেশ বিচিত্র। —সবাই একসাথে বলে উঠে কিরকম, কিরকম? —অন্ধকার হলে এরা খাবার থেকে একটু দূরে বসে থাকে, খাওয়াটা দেখা না গেলেও খাবার কিন্তু আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। ব্যাপারটা আর কিছুই নয় খাবার সামনে বসে এরা দ্রুত—সরু জিং দিয়ে পাত্র থেকে খাবার তুলে নেয়, এই কাজটা এত দ্রুত শেষ করে এরা মনে হয় যেন খাচ্ছেই না। এরকম আরেকটা স্তন্য-পায়ী প্রাণী একিড্না, যারা ডিম পাড়ে। দিনের বেলাতে এদের দেখা না গেলেও রাতে এরা খুব তৎপর। এদের খাদ্য পিঁপড়ের ডিম আর দুধ।

বাবা বলেন, না ভাই তোমার এই বিচিত্র সংসারের কথা একদিনে শেষ হবার নয়, আজকে অনেক দেরী হয়ে গেল আবার অন্য একদিন শোনা যাবে। কাকু বলেন, এ এক বড় মায়ার সংসার। যাক তোমরা আবার এস কিন্তু। পিকাই, বাবু, চৈতি, পিসি, মা সবাই বলে নিশ্চয়ই আমরা আবার আসব। গাড়িতে স্টার্ট দিতেই চৈতি বলে, দাঁড়াও দাঁড়াও এক মিনিট, কাকু তুমি কিন্তু ঘোষাল কাকুকে বলে দিও আমরা কোনদিনও পশুপাখীকে খাবার দেব না। পিকাই, বাবুও একসঙ্গে বলে উঠে সত্যি বলছি আমরা কোনদিনও দেব না। গাড়ি অধীরকাকুকে পেছনে ফেলে ওদের নিয়ে এগিয়ে যায়।

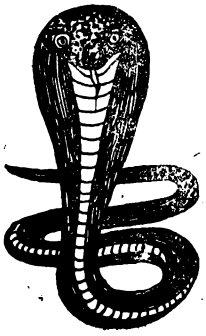

জ্ঞান-বিজ্ঞান

মহাশূন্যে খেলাধুলো

সরোজ ঘোষ

মহাশূন্যে ভ্রমণ কেবল অংক-কষা আর নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, খেলাধুলোও তার একটা বিশেষ অংশ জুড়ে থাকবে। কেননা মানুষ যেখানেই যায় সেখানেই শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আয়েস খোঁজে। যদিও মহাশূন্য-যুগের খেলাধুলো নিয়ে ভাবার সময় এখনো আসেনি তবু বিষয়টা নানারকম মজার ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। সেখানকার খেলাধুলায় থাকবে অবাক-করা নতুনত্ব কেননা পৃথিবীর বাইরে নতুন অভিকর্ষ ও ভূ-প্রকৃতি প্রচলিত খেলাধুলোর রীতিকেই কেবল বদলে দেবে না নতুন নতুন বিস্ময়কর খেলারও জন্ম দিতে পারে।

এখনকার মহাকাশযানের মধ্যে যে জায়গাটুকু থাকে তার মধ্যে খেলাধুলোর অবকাশ খুবই কম। অবসর সময়ে বড় জোর তাস বা দাবা খেলা চলতে পারে। হাত পা ছড়াতে গেলে মহাকাশযানের বাইরে বেরিয়ে মহাশূন্যে একটু ভেসে বেড়ানো ছাড়া উপায় নেই। যতদিন না চাঁদে বা অন্য কোন গ্রহে কিংবা কোন উপগ্রহের কক্ষপথে মোটামুটি বড় ধরণের ঘাঁটি মানুষের পক্ষে স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে ততদিন মহা-শূন্যের খেলাধুলো ঠিকমত দানা বাঁধতে পারবে না।

সিনেমা ও টেলিভিশনের দৌলতে চাঁদ এখন আমাদের অনেকটা চেনা হয়ে গেছে। বায়ুহীন চাঁদে যারা প্রথম বাস করতে যাবেন তাদের স্পেস-সুট পরে মহাকাশযান থেকে নামতে হবে। এই পোষাকটা বেশ বড়সড় আর জবড়জং কেননা এর মধ্যে কেবল প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের সরবরাহই থাকবে না বাইরের প্রচণ্ড শীত ও গরম থেকেও মানুষকে তা রক্ষা করবে কেননা আবহাওয়ার অনুপস্থিতির দরুণ চাঁদে সূর্যের আলো থেকে ছায়ায় পা বাড়ালে প্রায় চারশ ডিগ্রি উষ্ণতার হেরফের হয়। স্পেসসুট পরে কোন লোকের পক্ষে খেলাধুলো করা সম্ভব নয়। শীগগির বা দেরীতে হলেও চাঁদের অনেকটা জায়গা জুড়ে বড় বড় গম্বুজের মত বাড়ি তৈরি হবে, তার ভেতর জুড়ে থাকবে কৃত্রিম আবহাওয়া। এরকম বাড়ি তৈরি হলে তার মধ্যে মানুষের বাস সম্ভব হবে। সেখানে হাঁটাচলা এমনই অনায়াসসাধ্য হবে যে পৃথিবীর লোক তা দেখে ঈর্ষান্বিত হবে, কিন্তু তেমন সহজভাবে কখনো হাঁটতে পারবে না। কেননা চাঁদের অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের এক-ষষ্ঠাংশ। পৃথিবীতে যে মানুষের ওজন ৬০ কেজি চাঁদে ওখানে তার ওজন মাত্র ১০ কেজির মত হবে।

সুতরাং চাঁদে যে কোন জিনিষ ছুঁড়লে পৃথিবীর তুলনায় তা ছ'গুণ দূরে গিয়ে পড়বে। চাঁদে হাই-জাম্প তাই একটা দেখার জিনিষ হতে পারে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত হাই জাম্পে রেকর্ড ৭ ফুটের কিছু বেশি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে চাঁদে মানুষ ৪২ ফুট লাফাবে। পৃথিবীতে যখন কোন খেলোয়াড় ৭ ফুট লাফায় তখন সে আসলে ৫ ফুট লাফাচ্ছে। তার দেহের ভরকেন্দ্র—যা প্রায় কোমরের কাছাকাছি—সাধারণত মাটির তিনফুট ওপরে থাকে। সুতরাং সেদিক

থেকে দেখতে গেলে চাঁদে হাই জাম্পের রেকর্ড ৩০ ফুটের মত হতে পারে আর সমস্ত কাজটা সারতে সময় লাগবে প্রায় দশ সেকেণ্ডের মত। ব্রড জাম্প রেকর্ড—পৃথিবীতে এখন যা ২৭ ফুটের মত—চাঁদে ১৫০ ফুটের বেশি হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত চাঁদে কৃত্রিম আবহাওয়া-ভরা গম্বুজের মত বাড়িগুলো ডিসকাস ছোঁড়া (এখনকার বিশ্বরেকর্ডের পরিপ্রেক্ষিতে চাঁদে আনুমানিক রেকর্ড দূরত্ব ১১৭৫ ফুট) বর্শা ছোঁড়া (১৫০০ ফুট) বা হাতুড়ি ছোঁড়া (১২৮০ ফুট) ইত্যাদি খেলাগুলোর পক্ষে অনুপযুক্ত হতে পারে। এমনকি ১৬ পাউণ্ড ওজনের শটপুট খেলাটির জন্যে স্থান-সংকুলান করা সম্ভব নাও হতে পারে কেননা চাঁদে ১৬ পাউণ্ডের ওজন দাঁড়াবে মাত্র আড়াই পাউণ্ড যা সেখানে প্রায় ৩৭৫ ফুট পর্যন্ত ছোঁড়া সম্ভব হতে পারে।

কেউ যদি চাঁদে গল্‌ফ্‌ বলতে চান তাহলে গল্‌ফ্‌ বলের ভেতরে রেডিও ট্রান্সমিটার বসিয়ে তার গতিপথ নির্ধারণ করতে হবে। পৃথিবীতেই গল্‌ফের বল ১২৯০ ফুট পর্যন্ত ছুটতে দেখা গেছে। চাঁদে প্রায় ১০০০০ ফুট অবধি তাকে পাঠানো সম্ভব। কেবল কম অভিকর্ষই নয়, বায়ুহীন পরিবেশও বলটাকে অনেকদূর অবধি ছুটে যেতে সাহায্য করে। এইসব থেকে বোঝা—যাচ্ছে প্রচলিত খেলাগুলো যদি আমরা চাঁদে খেলতে চাই তাহলে খেলার সরঞ্জামগুলোকে বদলাতে হবে। অবশ্য বলছি না যে গল্‌ফ্‌ বলের ভেতরে সীসে পুরে সেটাকে ভারী করতে হবে, কিন্তু আমাদের ঐরকমের কোন সমাধানে আসতেই হবে।

কতকগুলো খেলা কিন্তু অভিকর্ষের পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল নয়। এইসব খেলা ভার বা ওজনের ওপর নির্ভর করে না, করে ভরের ওপর। অভিকর্ষই যে কোন বস্তুর ওজন নির্ধারণ করে। সেইজন্যে যে বস্তুর ওজন পৃথিবীতে এক কেজি, চাঁদে সতেরো গ্রাম, সূর্যে আঠাশ কেজি, কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান উপগ্রহে তার ওজন বলে কিছু থাকে না। অথচ ভর কিন্তু অভিকর্ষ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই সমান। কক্ষপথে যে বস্তু ভারহীন সেখানেও তার মধ্যে গতি সঞ্চার করতে গেলে পৃথিবীতে যে শক্তি প্রয়োগ করতে হয় সেই একই শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। সুতরাং চাঁদে বা অন্য গ্রহে রীতিনীতি বা সাজসরঞ্জাম না বদলিয়ে যে সব খেলা চালানো সম্ভব তার তালিকায় থাকবে বল গড়ানো, মাটির ওপর কিছু টেনে নিয়ে যাওয়া বা বল মাটিতে ড্রপ দিয়ে ওপরে তোলা—এই ধরনের খেলা। উদাহরণ হিসেবে আপাতত বিলিয়ার্ড, বোলিং ও বাস্কেট বল-এর নাম করা যেতে পারে।

ভবিষ্যৎ বসবাসকারীরা চাঁদে যে বায়ুপূর্ণ গম্বুজগুলো গড়ে তুলবে তার ভেতরে তারা পাখির মত উড়তে পারবে। পৃথিবীর চেয়ে চাঁদে মানুষের পক্ষে ওড়ার কাজটা সহজ হবে। বাদুড়ের মত হাতের সঙ্গে পাখা বেঁধে আমরা হয়তো স্বপ্নে দেখা ওড়ার পরিকল্পনাকে সফল করতে পারবো। তখন ওয়াটারপোলোর মত শূন্যে ভাসতে ভাসতে নতুন কোন খেলায় আমরা মেতে উঠবো।

মঙ্গল গ্রহের অভিকর্ষ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ, চাঁদের দ্বিগুণ। এই গ্রহটিতে চাঁদের মত এলাহী সাজসরঞ্জাম ছাড়াও আমরা অবতরণ করতে পারি। মঙ্গল গ্রহে হালকা আবহাওয়ার স্তর আছে যদিও তা নিঃশ্বাস নেবার উপযোগী নয়। দিনের বেলায় সেখানে মোটামুটি গরম। অক্সিজেন-মাস্ক পরে আমরা সেখানে হয়তো টিঁকে থাকতে পারি। অন্য গ্রহগুলো হয় খুব ঠাণ্ডা নয়তো খুব গরম। চাঁদ মঙ্গলগ্রহ এবং অন্য বিশাল গ্রহগুলোর বিশেষ উপগ্রহগুলোয় অভিকর্ষ মোটামুটি কিছুটা আছে। কিন্তু এছাড়া সৌরজগতে এমন অনেক ছোট ছোট উপগ্রহ আছে যেখানে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে পারে। মঙ্গলগ্রহের ছোট্ট উপগ্রহ 'ফোবোস'-এর কথাই ধরা যাক। প্রায় দশমাইল ব্যাসের পাহাড়-ঘেরা এই উপগ্রহটির অভিকর্ষ খুবই কম। ফোবোসের মাটিতে যে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে তার ওজন হবে প্রায় চার আউন্সের মত। পৃথিবীতে ৬০ ফুট উঁচু থেকে যে পাথরের মাটিতে পড়তে সময় লাগে দুসেকেণ্ড,—ফোবোসে তার সময় লাগবে এক মিনিটের মত। কেউ যদি এখানে হাইজাম্প দেবার চেষ্টা করে তাহলে তার পক্ষে মাটিতে নেমে আসা সম্ভব নাও হতে পারে। সত্যিই বাইরের সাহায্য ছাড়াই সেখানকার অভিকর্ষকে অতিক্রম করার বেগ অর্জন করা মানুষের পক্ষে খুব অসম্ভব নয়। আমাদের গ্রহ পৃথিবীকে অতিক্রম করতে গেলে ঘণ্টায় ২৫০০০

মাইল গতিবেগ লাভ করা দরকার। কিন্তু ফোবোস-এর মত ছোট উপগ্রহের অভিকর্ষকে অতিক্রম করে কোন বস্তুকে চিরকালের মত বাইরের জগতে পাঠাতে গেলে তার মধ্যে ঘণ্টায় মাত্র কুড়ি মাইল গতিবেগ সঞ্চার করাই যথেষ্ট।

এরকম অল্প অভিকর্ষ-সম্পন্ন উপগ্রহে প্রচলিত খেলাধুলো বানানো সম্ভব নয় কেননা খোলা জায়গায় কোন বস্তুকে ঠেলে দিলে বা জোরে আঘাত করলে তা মাটির ওপর প্রায় সমান্তরাল শূন্যপথে উড়তে উড়তে চোখের আড়াল হয়ে যাবে। ফোবোস-এ দাঁড়িয়ে ঘণ্টায় মাত্র দশ মাইল বেগে কোন পাথরকে মাটির সমান্তরালভাবে ছুঁড়ে দিলে সেটা ফোবোস-এর একটা উপগ্রহে পরিণত হবে, তার চারদিকে ঘুরতে থাকবে আর দুতিন ঘণ্টা পরে ফোবোস-এর ওপর ফিরে এসে পড়বে। এইসব উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে কেউ যদি আন্তগ্রহ অলিম্পিকের আয়োজন করেন তাহলে খুবই মুস্কিলে পড়বেন। তখন খেলাধুলোর সমস্ত রেকর্ডের সঙ্গে জানিয়ে দিতে হবে কোন গ্রহে ঐ রেকর্ড হয়েছে। বিশেষ করে ওজন-তোলার খেলাটি খুবই বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়াবে কেননা এমন গ্রহও থাকবে যেখানে মাত্র ৯৭ আউন্স ওজনের মানুষ ৫ টন ওজন তুলতে পারবে।

আমরা এ পর্যন্ত এমন সব গ্রহে খেলাধুলোর কথা আলোচনা করলাম যেখানে অন্ততঃ কিছুটা অভিকর্ষ আছে। কিন্তু মহাকাশযানের মধ্যে যখন ভারের প্রশ্ন অবান্তর হয়ে দাঁড়ায় তখন সেখানে কি ধরণের খেলাধুলো সম্ভব? মহাকাশযানে ওড়া সহজ না হলেও এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে তা অপরিহার্য। খুব বড় বড় কৃত্রিম উপগ্রহের ভেতরে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় নানা রকম কলাকৌশলের খেলা দর্শনীয় হতে পারে।

মহাশূন্যে তরল পদার্থের ব্যবহার এমন সব মজার সম্ভাবনার সৃষ্টি করতে পারে যা শিল্প ও খেলাধুলোর পথে সমান উপযোগী। ওজনহীন তরল পদার্থ পৃষ্ঠ-টানের প্রভাবে গোলকের আকৃতি নেয়। স্পন্দনের প্রভাবে তরল পদার্থ সব রকমের আকৃতিতে দোলায়িত হতে পারে। দোলন খুব বেশি হলে বোলতার আকৃতি নিতে নিতে সরু কোমরের কাছে তরল পদার্থ আরো ছোট ছোট গোলকে ভেঙে যায়। আধুনিককালের 'মোবাইল' বা 'চলন্ত শিল্প-কলা' ভবিষ্যতে হয়তো জল-ভাস্কর্যের রূপ নেবে। দুঃখের বিষয় সে দৃশ্য পৃথিবীর কোন আর্ট-গ্যালারিতে দেখা যাবে না। সেই অপরূপ দৃশ্য দেখতে গেলে শিল্প-রসিকদের মহাশূন্যে যেতে হবে।

মহাশূন্যে যে সব হোটেল তৈরি হবে তার প্রধান আকর্ষণ হিসেবে থাকবে গোলকাকৃতি সুইমিং পুল। সেটা এমন ফাঁপা গোলক হতে পারে যার ভেতরে বায়ুচাপের মধ্যে বসে দর্শকেরা তাদের চারদিকে বন্ধুদের স্নান করতে দেখতে পাবে। মহাশূন্যে অভিকর্ষের অনুপস্থিতি ছাড়াও আরো অনেক জিনিস আমাদের শারীরিক কর্মক্ষমতার ওপর প্রভাব বিস্তার করবে আর তা থেকে নতুন ধরণের খেলার জন্ম হতে পারে। অবশ্য এখনই সেইসব খেলার প্রকৃতি ও সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করা শক্ত। একদিন হয়তো আমাদের উত্তর-সূরীরা গ্রহান্তরে যাওয়ার পথ সুগম করে সেখানে নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করতে পারবে। কিন্তু মহাশূন্য ও বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ সম্বন্ধে যে ছবি আমরা এঁকে চলেছি তা নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ থাকবে যদি আমরা কেবল জ্ঞান ও শক্তির মধ্যেই তাকে সীমাবদ্ধ রাখি। কেননা মহাশূন্য একটা বিরাট খেলার 'মাঠ' ও বটে যেখানে নতুন নতুন খেলার অজস্র সম্ভাবনাকেও কখনই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

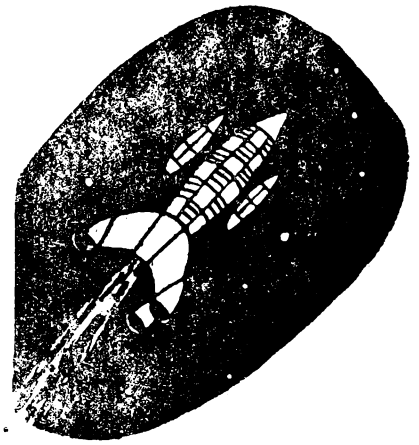

ট্যারা চোখের কারসাজি

সৌমেন দাস

শুরুতেই বলে নিই, সাদাকে সাদা বলার মতোই, আমি ট্যারাকে ট্যারাই বোলবো। তবে, ট্যারা চোখের কারসাজি জানার আগে, আমাদের চোখগুলো একপলক দেখে নিই, কেমন ?

আমাদের চোখ, যাকে ভালো বাংলায় অক্ষিগোলক বলে, তা আমাদের করোটির অক্ষিকোটরে থাকে ; গাছের গর্তে থাকা পাখীর মতোই বলতে পারো। যে কোন মীনাক্ষির দিকে তাকাতে গিয়েই টের পাবে, মাথাকে না ঘুরিয়েই, এই অক্ষিগোলককে বিভিন্ন দিকে ঘোরানো যায়। আর এই কাজটা করে, ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটি পেশী। আসলে, এরা দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে চোখের দিকে আসা আলোকে চোখের তারা বা 'পিউপিল্' এর মধ্যে দিয়ে চোখের ভেতরে পাঠানোর কাজে সাহায্য করে। চোখকে নানাদিকে ঠিক করে ঘুরিয়ে নিয়ে।

চোখের তারার মধ্যে দিয়ে ঢুকে পড়া আলো, এরপর, চোখের ভেতরে থাকা 'লেন্স' ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে, একদম পিছনে গিয়ে জাগিয়ে দেয় স্নায়ুকোষগুলোকে। যাকে বলা হয় 'রেটিনা'। কোন জিনিসকে ভালোভাবে দেখার জন্য, আলোকে আবার বিশেষ একটা জায়গায় ফেলতে হয়, তাকে বলা হয় 'ম্যাকুলা'। বলা বাহুল্য, দুই চোখের রেটিনার অনুরূপ জায়গায় আলো না পড়লেই বিপদ ! একটা জিনিস থাকা সত্বেও জোড়া জোড়া ঠেকবে চোখে। রেটিনার স্নায়ুকোষগুলো উত্তেজিত হবার পর, সেখান থেকে খবর ছোটে, আমাদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায়। আর তারপরই আমরা জিনিসটাকে দেখি আর বুঝতে পারি।

এক চোখের মতো, চোখের দেখা নিয়ে অনেক কিছুই জানলাম। সোজাভাবে বলতে গেলে, আমাদের কোন জিনিসকে ভালোভাবে দেখতে হলে, দুটো চোখকে এমনভাবে নাড়াচাড়া করে বসাতে হবে, যাতে ঐ জিনিস থেকে আলো এসে, ডান এবং বাঁ চোখের ম্যাকুলায় পড়ে। অবশ্য, এরই সঙ্গে সঙ্গে রেটিনার স্নায়ুকোষগুলোকেও ভালো করে কাজ করতে হবে। বলা বাহুল্য, চোখকে নাড়াচাড়া করে বসানোর কাজটা আমাদের 'রিফ্লেক্স' বা প্রতিবর্ত ক্রিয়াই সম্পন্ন করে থাকে, এ নিয়ে আমাদের ভাবতেই হয় না।

ট্যারা চোখের বেলায়, ব্যাপার কি হয় ? চোখকে ঘোরাবার ছোট্টো ছোট্টো পেশীগুলোর একটি বা দুটি অসুস্থ থাকতে পারে। যার ফলে চোখের নড়াচড়া, বিশেষ কোন দিকে, প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যদি এই ব্যাপারটা একটা চোখের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে, তবে ট্যারা চোখের বাঁকা চাউনি ধরা পড়বে, কেবল যে পেশী অকেজো বা কমজোর, সেই পেশীর কাজের দরকারের সময়। আর দু'চোখে দুটি পেশীর ধর্মঘটের ক্ষেত্রে, দু'টো চোখই, সবসময় ট্যারা বলে মনে হবে। তাছাড়া, এঁরা এক একটি দ্রষ্টব্যকে জোড়া জোড়া দেখবে। এ ধরণের তীর্যক দৃষ্টির লোকদের, মাথা বা ঘাড় বাঁকিয়ে কোন জিনিসকে দেখতে হয়। কারণ, এঁদের চোখ ঘোরানোর কাজটা ঠিকমতো হয় না। আর জোড়া জোড়া জিনিস দেখতে পাওয়ার সুবাদে মাথাঘোরা, গা বমি বমি করা এসব সমস্যাও থাকতে পারে।

অক্ষিগোলকের পেশীর অকর্মণ্যতার দুর্ঘটনাটা জন্ম থেকেই থাকতে পারে, অথবা মাথায় আঘাত, মেনিনজাইটিস, এনসেফেলাইটিস বা মস্তিস্কের টিউমার ইত্যাদির জন্যও হতে পারে। ছোটদের ক্ষেত্রে, এর চিকিৎসা ঠিকমতো এবং তাড়াতাড়ি না করতে দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে পারে, শেষমেষ দৃষ্টিহীনতার শিকারও হতে হয়।

দ্বিতীয় রকমের ট্যারা চোখের কাহিনীটা অন্যরকম। এদের চোখের পেশী, প্রতিবর্ত ক্রিয়া সবই ঠিকঠাক থাকে। গন্ডগোল বাধায় ঐ শেষ পর্দা, 'রেটিনা'। ওদিকে দৃষ্টি-পাত করলেই দেখা যাবে, ওদের চোখের রেটিনায় 'ম্যাকুলা' জায়গাটা ঠিক অনুরূপ জায়গায় নেই। কাজেই ওদের দুটো চোখকে দুভাবে ঘুরিয়ে বসিয়ে নিতে হয় দেখার জন্য অথবা একটাকে দুটো না দেখতে চাওয়ার জন্য। যাদের কাছের দৃষ্টি খুব খারাপ, তাদেরও এই ব্যাপারটা হতে পারে।

এছাড়া, চোখের গোলকের সতেজ পেশীগুলো গোলকের ঠিকঠাক জায়গায় নাও থাকতে পারে—যার ফলে ট্যারা চোখ তৈরী হতে পারে। বুঝতেই পারছো, এরা কিন্তু একটাই দেখে, সাধারণতঃ! অবশ্য, খুব বেশী উল্টোপাল্টা থাকলে দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হতে পারে! ঠিকমতো না দেখার জন্য এদের চোখের রেটিনায়, ম্যাকুলা বলে জায়গাটা পরিণত নাও হতে পারে।

কাজেই, অসুবিধেজনক ট্যারা চোখের জন্য অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা করানো প্রয়োজন তো বটেই, সামান্যতম ট্যারা থাকলেও বা ধরা পড়লেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এ ঘটনাটা কিন্তু বিশেষ জরুরী, তা ভুললে চলবে না। তার প্রধান কারণ, জন্মাবার পর থেকেই ট্যারা বাচ্চারা যদি জোড়া জোড়া প্রতি-বিম্ব দেখে, তবে সেই অসুবিধেটা তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে না—বোঝানোর কথা তো ওঠেই না।

ট্যারা চোখের ভেতরের এই খবরাখবরগুলো জানার পর, নিশ্চয়ই কোন বিচক্ষণ অভিবাবককে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হবেনা, তাঁর বাচ্চার ট্যারা চোখের কারসাজি সত্যি সত্যিই দৃষ্টিশক্তির বিপক্ষে কতটা কারসাজি করে যাচ্ছে।

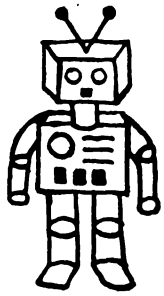

রোবোট OPD2

পার্থ মুখোপাধ্যায়

নাম তাঁর ওপিডিটু, পাঁচ ফুট লম্বা ;
শ-দুই পাউণ্ড ভার, গতরে কি কম বা !
ফ্লোরিডার চোরেদের সেদিন কি কান্না—
লাল চোখো রোবোটটি ঘুষ টুষ খান না,
ওপিডিটু সাহেবের হৃদয়টা শক্ত,
পুলিশ বিভাগে তাঁর অগণিত ভক্ত।

কিন্তু হঠাৎ এক যান্ত্রিক ভুলে,
পুলিশি উর্দি তিনি রাখলেন খুলে।
হা হুতাশ পড়ে গেল বিজ্ঞানী মহলে,
ফ্লোরিডার কি যে হবে ওপিডিটু না হলে !

যা কিছু শেখানো ছিল ভুলে গেল সবই তা,
ওপিডিটু আজকাল লেখে শুধু কবিতা।

মুদে বিজ্ঞানীর প্রজেক্ট

উঃ কি ভ্যাপসা গরমই না পড়েছে! লিটল সায়েন্টিস্ট ক্লাবের লাইব্রেরীতে একটা ফ্যান না হলে তো আর চলছে না। ডিংকু এসে ছোটমামাকে সে কথা বলতেই উনি একটা পুরানো ফ্যানের তার পালটিয়ে সেটাকে একেবারে নতুন করে দিলেন। ছোটর দল অবাক হয়ে দেখতে লাগল ছোট মামার কার্য-কলাপ। ছোট মামা ওদের ফ্যানের মোটরটা ভাল করে দেখিয়ে দিলেন। হাসুবানু সেটা দেখে কর্ক আর কতগুলো বড় পিন দিয়ে ভারী মজার চমৎকার একটা মোটর বানিয়েছিল। তোমরাও এই ধরণের একটা মোটর তৈরী করে সকলকে অবাক করে দিতে পারো।

একটা কর্ক বা শোলার ছিপি জোগাড় করে ব্লেড দিয়ে তার দুটো পিঠ ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে কেটে নাও। কর্কের উপরের দিকটায় যেমন কাটা হয়েছে পিছনেও সেই রকম কাটতে হবে—এটা ছবিতে দেখানো হয়নি। এরপর টেবিল ল্যাম্পের ইলেকট্রিক তার ব্লেড দিয়ে কেটে বের করে নিয়ে ঐ শোলার কাটা জায়গায় উপর-নীচ বেশ কয়েক পাক জড়িয়ে নিতে হবে।

দুটো পিন শোলার দুদিকে আটকে দিলে ওটা হাল-এর মতো কাজ করবে (axle)। তার জড়ানোর পর শেষ প্রান্ত দুটি আটকানোর জন্য শোলার সামনের দিকে আরও দুটো পিন লাগিয়ে দাও। এই শেষ প্রান্ত দুটির মধ্য দিয়েই কারেণ্ট ঢুকবে এবং বেরুবে। তোমার মোটরের আর্মেচার তৈরীর কাজ তাহলে এখন শেষ। খুব পাতলা টিন অথবা তামার পাত 'ব্রাশ' হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। একটা মোটা কার্ডবোর্ডের উপর (পাটাতন) ঐ পাতলা টিনের পাত ড্রইং পিন দিয়ে আটকে দাও। আর্মেচারের axle বসানোর জন্যে দুপাশে দুটো করে পিন কোণাকুণি লাগাতে হবে।

একটা হর্স-সু চুম্বক জোগাড় করে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে বসাও। এইবার ব্যাটারীর সঙ্গে তার জুড়ে দিলেই দেখবে কেমন মজা—তোমার পিন আর শোলা দিয়ে তৈরী মোটর চমৎকার ঘুরতে আরম্ভ করেছে।

তুমি অবশ্য এমন একটা আর্মেচার বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারো যাতে কর্কই নেই। একটা পেন্সিলের উপর তার জড়িয়ে তারপর ওটাকে লুপ-এর মতো করে বাইরে এনে সুতো দিয়ে বাঁধ। এবার তারের শেষ প্রান্তও সুতো দিয়ে ভাল করে বেঁধে অ্যাডেসিভ পেপার দিয়ে আটকে একটা লম্বা পিনের (axle) সাথে রোল করে জুড়ে দাও। আগের মতো পাতলা টিন পাটাতনে আটকে তার মধ্যে পিনটা (axle) ঢুকিয়ে দিতে হবে।

আরও এক ধরণের মোটর তৈরী করে তুমি সত্যিকার আনন্দ পেতে পারো। এখানেও ব্যাটারী থেকে কারেণ্ট নেবার প্রয়োজন হবে।

একটা কাঠের বোর্ড (পাটাতন) ২০×২৫·৫ সেমি তৈরী কর। পাটাতনের মাঝখানে ছোট ছিদ্র করে তার মধ্যে একটা বড় ১৫·৫ সে. মি. পেরেক মাথা উল্টো করে ঢুকাও! পেরেকের ছুঁচলো দিকটা উপরে থাকবে। অন্য দুটো ১৫ সে. মি. পেরেকে সরু তার দিয়ে ১০০ বার ভাল করে জড়াও। পাটাতনের দুপাশে ৩ সে. মি. পরিমাণ জায়গা ছেড়ে দিয়ে পেরেক দুটোকে বসাও। এই দুটো পেরেকের মধ্যে দূরত্ব রাখবে ১৫·৫ সে. মি.। মাঝখানের পেরেক অর্থাৎ যেটা উল্টো

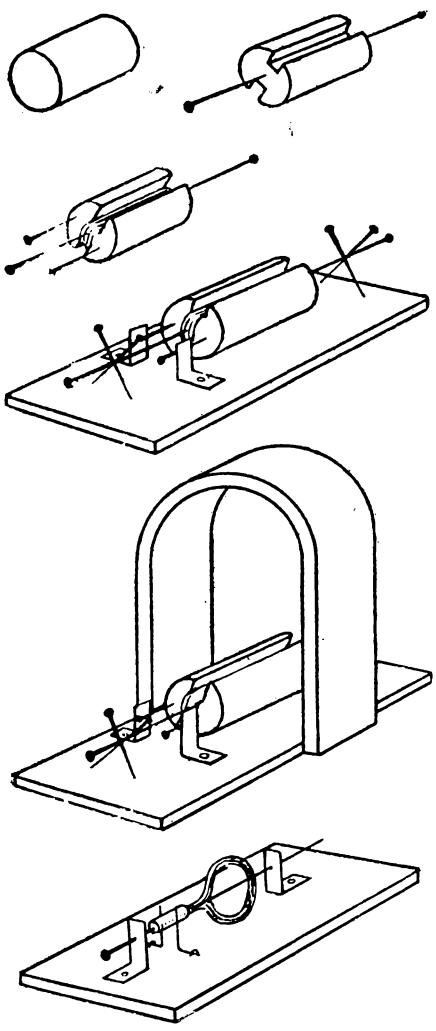

করে বসিয়েছ তার থেকে ৫ সেমি দূরত্বে কোণাকুণি দুটো ছোট পেরেক লাগাও। এই পেরেক দুটিতে তারের শেষ প্রান্ত জড়াতে হবে। এইবার তারটা বেঁকিয়ে মধ্যিখানের পেরেকের সংস্পর্শে নিয়ে এস। তারের প্রান্ত দুটি 'ব্রাশ'-এর কাজ করবে। ছবিতে যেভাবে তীরচিহ্ন দিয়ে তার আটকানো হয়েছে ঠিক সেইভাবে তার জড়ানো দরকার নইলে হবে না।

এতক্ষণে তোমার ফিল্ড ম্যাগনেট এর ব্রাশ তৈরীর কাজ শেষ। কেবল 'কমুটেটর' আর 'আর্মেচার' তৈরী করতে হবে।

একটা ৪ সেমি কর্ক নিয়ে তাতে অনুভূমিক ভাবে (Horizotally) একটা ১৩ সেমি পেরেক ঢোকাও। এই পেরেকটার দুপাশেই বার চল্লিশেক প্যাঁচ দিয়ে তার জড়াতে হবে। তারের গতিপথ কেমন হবে সেটা ছবি দেখে বুঝে নাও। এবার একটা ছুরি দিয়ে ঐ কর্কে অর্ধেক ফুটো কর। এই ফুটোর মধ্যে যেন ১০·৫ সেমি অথবা ১৩ সেমি টেস্ট টিউবের মুখ নীচের দিক করে ঢুকানো যায়। তোমার আর্মেচার তৈরী তাহলে হয়ে গেল।

কমুটেটর তৈরী করাও বিশেষ শক্ত নয়। পাতলা তামার পাত (৪×৪ সেমি) দিয়ে টেস্ট টিউবের গা জড়িয়ে দিতে হবে যেন দুটো প্রান্তের মধ্যে অন্তত ৪ মিলিমিটার জায়গা ফাঁক থাকে। এই তামার পাতের উপর দিকে সামান্য বেঁকিয়ে তাতে ফুটো করে আর্মেচার থেকে নেমে আসা

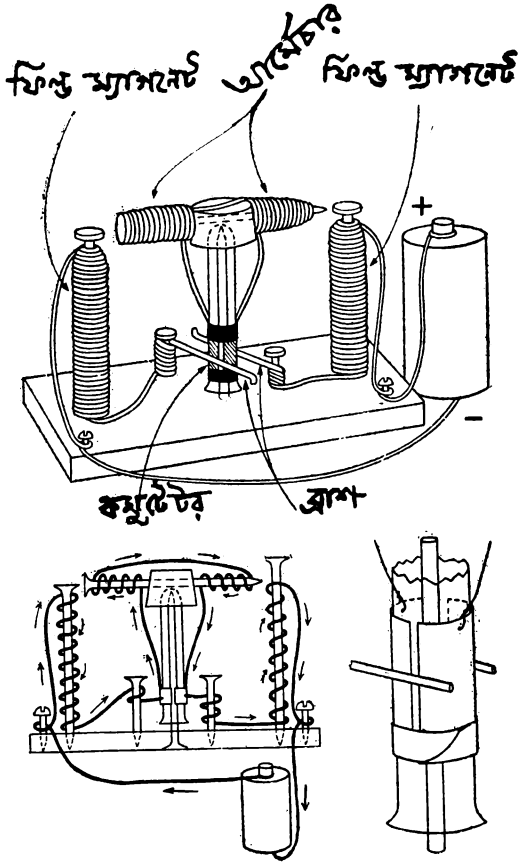

তারের প্রান্ত দুটো ঢুকিয়ে দিতে হবে। এই প্লেট দুটো যাতে ভালভাবে টেস্ট টিউবের সঙ্গে লেগে থাকতে পারে সেজন্য ওটার উপর নীচে দুটো এ্যাডেসিভ টেপ লাগাও।

তোমার মডেল তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে। 'ব্রাশ'-এর সঙ্গে 'কমুটেটরের' সংযোগ ঘটিয়ে দাও। এবার ব্যাটারী থেকে কারেণ্ট গেলেই দেখবে তোমার মোটর কেমন জোরসে ঘুরতে লেগে গেছে। আর্মেচারকে একবার হাত দিয়ে ঠেলা মেরে চালু করে দিলেই হবে। যদি কোনও কারণে ওটা না চলে তবে ব্রাশ দুটোকে কাছে এনে দেখবে স্পার্ক মারছে কিনা। ব্রাশের কোণ পাল্টে দিয়েও অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যায়। এটা করতে হলে ঐ ব্রাশ দুটো পেরেক থেকে খুলে নিয়ে আঙুলে করে কমুটেটর প্লেটের সামনে সমান্তরাল ভাবে ধর। তারপর ব্রাশ দুটোর কোণ পাল্টে দেখতে হবে কখন আর্মেচারটা ঘুরতে শুরু করছে। এটা করার সময় যদি তোমার বন্ধু আর্মেচারটাকে সামান্য ঠেলা দিয়ে ঘুরোয় তাহলে ভাল হবে। যে অবস্থায় আর্মেচার সব চাইতে দ্রুত ঘুরবে সেটাই হচ্ছে ব্রাশকে বসাবার সঠিক জায়গা।

□ **পার্থসারথি চক্রবর্তী**

অবিশ্বাস্য!

অসুখ হলে পিল বা বড়ি খেতে হয়! বড়িতে ভরা থাকে নানান ধরণের ওষুধ। কোনটা তেতো, কোনটা মিষ্টি। তেতো বড়ি খাওয়া খুবই কষ্টকর। তাই অনেক অসুখে ক্যাপসুল খেতে দেওয়া হয়। ক্যাপসুলের মধ্যে ভরা থাকে ওষুধ। ক্যাপসুল গেলার সময় ওষুধের কোন স্বাদ বোঝা যায় না। পেটের মধ্যে ক্যাপসুল গলে ওষুধ বেরিয়ে পড়ে। কাজ শুরু করে দেয় চটপট। আজকাল পাচকনালীর বিভিন্ন রোগ ধরার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে এক ধরণের ক্যাপসুল। এই ক্যাপসুলের মধ্যে কোন ওষুধ থাকে না। এতে রেখে দেওয়া হয় ছোট্ট একটা বেতার যন্ত্র বা রেডিও। এই ক্যাপসুলটা গলে যায় না পেটের মধ্যে। মুখ দিয়ে ঢুকে মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসে। এরমধ্যে পেটের ভিতরকার যাবতীয় খবর আমাদের জানিয়ে দেয় স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে। আমরাও বাইরে থেকে বসে সব সংকেত ধরে নিই। এইভাবে পাচকনালীর মধ্যে জীবাণুর আক্রমণে হঠাৎ কোন অংশে প্রদাহের সৃষ্টি হলে রেডিও পিল, আমাদের জানিয়ে দেয় সংকেত ধ্বনির মাধ্যমে। এছাড়া পাকস্থলীর মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টায় অম্লের মাত্রা এই রেডিও পিলের সাহায্যে অতি সহজে জানা যায়। এইভাবে পাকস্থলীতে অম্লের অতিরিক্ত ক্ষরণে আলসার বা ক্ষতের সম্ভাবনা আগাম বোঝা যায়।

এক সময়ে বিড়াল, কুকুর থেকে আরম্ভ করে মানুষ বেলুনে করে আকাশে ভেসে বেড়িয়েছে। চলে গেছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের শুরুতেও বেলুন উড়ান হয়েছে শুভ-প্রতীক হিসেবে। আজও বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কাছে বেলুন অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। সেই বেলুনকে এখন কাজে লাগান হচ্ছে হৃৎরোগের মত কঠিন অসুখে। হৃৎরোগের হঠাৎ আক্রমণে রক্তচাপ খুব কমে গেলে অথবা অপারেশনের সময় হৃৎযন্ত্র অকেজো হয়ে পড়লে বেলুনের সাহায্যে আজকাল সেটা শুধরে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। পাম্পের সাহায্যে বেলুনকে কখনো ফুলিয়ে কখনো কমিয়ে হৃৎযন্ত্রকে সচল করা হচ্ছে। তবে কাজটা মোটেই সহজ নয়। ফেমোরাল ধমনীকে কেটে প্রথমে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ধমনীর মধ্যে। পরে সরু নলের মাধ্যমে বেলুনটাকে টেনে আনা হয় মহাধমনীতে। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণের সময় বেলুনের মধ্যে গ্যাস ঢুকিয়ে ফোলান হয়, সাধারণতঃ হিলিয়াম অথবা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস দেওয়া হয়। এরই জন্যে মহাধমনীতে চাপ বাড়ে। সারা দেহের সঙ্গে হৃৎপিণ্ডেও রক্ত ছড়িয়ে পড়ে বেশি পরিমাণে। এর ফলে মহা ধমনীতে চাপ কমে। হৃৎযন্ত্রের রক্ত পাম্প করতে কোন অসুবিধে হয় না। হৃৎরোগে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে বেলুনের ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে! এখনও পর্যন্ত সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় এক লক্ষ বেলুন। ইংল্যাণ্ডে 'এ্যাডকো মডেল ৭', 'মডেল ১০', 'ডাটাস্কোপ সিসটেম ৮০' ও '৮২' খুবই প্রচলিত। এদেশেও হৃৎরোগে এ ধরণের বেলুন ব্যবহার করা হচ্ছে বড় বড় হাসপাতালগুলোতে।

□ **প্রদীপকুমার দাস**

মনের জানালা

ইচ্ছের জোর !

সরমাদি ঘরে ঢুকতেই অন্তু লাফ দিয়ে উঠল।—আজ পড়াটড়া ধরার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আপনাকে।

হেসে ফেললেন সরমাদি। চেয়ারটায় বসে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন—তোমার তাড়া দেখেই বুঝতে পারছি, প্রশ্নটা খুবই জরুরী। আর দেরী না করে বলেই ফ্যালো···

—আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে রোগা পটকা ছেলেটার নাম গোপাল। ওর নামও যেমন—আচার আচরণেও তেমনি একেবারে 'সুবোধ বালক' যাকে বলে। রেগে গিয়ে সেই ছেলেটাই আজ কি ভয়ংকর মূর্তি ধরল আপনাকে কি বলব! আমাদের চেয়ে দু' ক্লাস নিচে পড়ে একটা দারুণ পালোয়ান আর গুণ্ডা ধরনের ছেলে—সবাই ওকে রাবণ বলে ডাকে। রাবণ বোধহয় আজ গোপালকে কোনও খারাপ কথাটথা বলেছিল। স্কুলের ছুটির পর খেলার মাঠে দু'জনের মারপিঠ হল। বললে বিশ্বাস করবেন না ঐ হাড় জিরজিরে গোপাল—যাকে দেখলেই চারমূর্তির প্যালারামের কথা মনে পড়ে—সেই গোপাল কি মারটাই না মারল রাবণকে। ওদের মারপিট দেখতে দেখতে আমার সেই মন্ত্রশক্তির গল্পটা মনে পড়ে গেল। সেই যে ঈশ্বর লাঠিয়াল একা একটা গোটা লাঠিয়ালের দলকে কাবু করেছিল। গল্পের শেষে ঈশ্বরের সেই বিখ্যাত কথা ঃ হুজুর আমি মন্তর-তন্তর কিছুই জানিনে। তবে লাঠি সড়কি ধরামাত্র আমার শরীরে কি যেন ভর করে। লেখক বলেছিলেন—ঈশ্বরের ঐ শক্তিটা নাকি মন্ত্রশক্তি—যার শরীরে ভর করে সে নাকি সব কিছুতেই জিতে যায়। জানেন সরমাদি, আজ মারপিটের সময় আমাদের সেই রোগা পটকা গোপাল যখন রুদ্র মূর্তি ধরে পালোয়ানটাকে বেধড়ক পিটছিল—আমার মনে হল ঃ ওর কাঁধেও বুঝি অলৌকিক শক্তি ভর করেছে। আচ্ছা, সত্যি সত্যি কি মন্ত্রশক্তি বলে কিছু আছে ?

—মন্ত্রশক্তি বলতে যদি ইচ্ছাশক্তিকে বোঝায় তবে বলব হ্যাঁ ; ইচ্ছাশক্তির জোরে মানুষ কি না করতে পারে ! মুমূর্ষু রোগী শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির জোরে দিনের পর দিন বেঁচে রয়েছে, ইচ্ছের জোরে মানুষ দুর্লঙ্ঘ্য সাগর পর্বতকে জয় করেছে—এমন ঘটনাতো বিরল নয়। আমাদের মধ্যে ইচ্ছেশক্তি কিভাবে জেগে ওঠে সেটা বুঝতে গেলে অবশ্য তোমাকে প্রেরণা বা 'মোটিভেশনে'র ব্যাপার-স্যাপারগুলো জানতে হবে।

—বেশ তো, বলুন না একটু শুনি। অন্তু সরমাদির কথা শোনার জন্য একবারে তৈরী।

—তাতো শুনবেই। কিন্তু ক্লাসের পড়াগুলো তৈরী করবে কখন ? সরমাদি গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেলেন।

অন্তু মাথা নীচু করতেই সরমাদি বললেন, উঁহু, আর লজ্জা পেতে হবে না। আমি বলছি। 'প্রেরণা' বা ইচ্ছার ব্যাপারটা বোঝাতে গেলে—আগে আমাদের শরীর মনের

বিভিন্ন চাহিদার কথাগুলো বলতে হয়। আচ্ছা বলতো দেখি বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কোন কোন জিনিসের একান্ত প্রয়োজন ?

—খাদ্য, বাসস্থান, জামা কাপড়···অন্তু যেন মুখস্থ বলে যায়।

—হ্যাঁ, সেইসঙ্গে—মানুষের সঙ্গ, ভালবাসা, নিরাপত্তা —বেঁচে থাকার জন্য এগুলোও মানুষের প্রয়োজন। এ সবগুলোকে বলা যেতে পারে—সামাজিক বা মানসিক চাহিদা—এদের কথায় পরে আসছি। তুমি যে একটু আগে শারীরিক চাহিদাগুলোর কথা বললে—তার মধ্যে প্রথমেই আসে খাদ্য, পানীয়, ঘুম—এদের কথা। খাদ্য পানীয় আমাদের শরীরকে শক্তি যোগায়। শরীরের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর শরীর থেকে নোংরা আবর্জনাগুলি বেরিয়ে যাওয়াও দরকার। এগুলি হল আমাদের প্রাথমিক চাহিদা। প্রাথমিক চাহিদার মধ্যে ঘুমকেও ধরতে হবে। বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেকটা প্রাণীরই নিয়মিত ঘুমের প্রয়োজন। ক্ষিদে, তেষ্টা, ঘুম ঠিকমতো না হলে শরীরে যন্ত্রণার অনুভূতি হয়—আর সেই যন্ত্রণা কাটাতে মানুষ তখন খাদ্য পানীয় খোঁজে, ঘুমের ওষুধ খায়। বুঝতেই পারছো—মানুষ যে সারাদিন কাজকর্ম খাটাখাটনি করে—সে আসলে ঐ প্রাথমিক চাহিদাগুলির পূরণের জন্যই।

—কিন্তু এর সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির সম্পর্কটা···। অন্তুর কাছে ব্যাপারটা কেমন অস্পষ্ট ঠেকে।

—বুঝতে পারলে না ? ক্ষিদে, তেষ্টা, ঘুম—এসব প্রাথমিক চাহিদাগুলো যে প্রেরণার জন্ম দেয় তা যদি কোনও কারণে খুব বড় আকার ধারণ করে—তখনই তো ইচ্ছাশক্তির খেল শুরু হয়। বুঝিয়ে বলছি। ধর, সারাদিন তোমার খাওয়া হয়নি—অনেকটা রাস্তা হেঁটে তুমি বাড়ী ফিরছ। পা যেন তোমার আর চলছে না। তারপর এক সময় দূর থেকে যেই তোমার বাড়ীটা নজরে এল—অমনি দেখবে, তোমার হাঁটায় গতি গেল বেড়ে। এর কারণটা কি বলতো দেখি ?

—ক্ষিধে ! অন্তু জবাব দেয়।—বাড়ীতে গেলেই ক্ষিধে মিটবে এটা মনে পড়ে গেলেই তো হাঁটার স্পীড বেড়ে যাবে।

—ঠিক তাই। সরমাদি সায় দেন।—এটাকেই একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি, ক্ষিদের অনুভূতি তোমার মনে এমন এক প্রেরণা যোগাল যার বলে তুমি চরম ক্লান্তির মধ্যেও ছুটতে পারলে ! অর্থাৎ ক্ষিদে মেটানোর তাগিদটা তোমাকে দিয়ে অসম্ভব একটা কাজকে সম্ভব করল। খাদ্য, পানীয়, ঘুম বা মল মূত্রত্যাগের মত সন্তানোৎপাদনের ব্যাপারটাও কিন্তু যে-কোনও প্রাণীর একটা প্রাথমিক চাহিদা। জড়বস্তুর সঙ্গে প্রাণীদের তফাৎটাই হল—প্রাণীদের জন্ম মৃত্যু আছে, প্রাণীদের বৃদ্ধি হয়, প্রাণীরা সন্তানের জন্ম দেয়।

অন্তু বলে—আপনি যে মানসিক চাহিদার কথা বলবেন বলছিলেন।

—হ্যাঁ সেদিকটাতেই এবার আসছি। তবে তার আগে বলে নিই, একটু আগে যে শারীরিক চাহিদাগুলির কথা বলছিলাম—সেগুলির ঠিকমতো পূরণ না হলে যেমন নানা রকমের শারীরিক বৈকল্য দেখা দেয় তেমনি মানসিক উপসর্গও কিছু কিছু তৈরী হয়। মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন—দীর্ঘদিন ধরে ঠিকমতো খাদ্য না পেলে মানুষের আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে ; দিনরাত তারা খাওয়ার কথা চিন্তা করে, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় বারে বারে খাবার-দাবারের প্রসঙ্গ টেনে আনে এবং সবচেয়ে বড় কথা—নিদারুণভাবে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তেমনি অনিদ্রায় ভোগে যারা—তারা যে নানা ধরনের হ্যালুসিনেসন বা ভ্রমের শিকার হয় তারও প্রমাণ রয়েছে বিস্তর।

ঠিক এই রকমই—আমাদের মনের যেসব চাহিদা আছে—সেগুলি অপূর্ণ থাকলে মন খারাপ যেমন হয় তেমনি শরীরের উপরও তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। মনের চাহিদা বলতে—অন্যের ভালবাসা, আত্মীয়তা, স্বীকৃতি—এগুলিকেই অবশ্য বোঝাচ্ছি। বেঁচে থাকার নিরাপত্তা, আত্মবিশ্বাস—এসব হল মানসিক চাহিদা যেগুলি পূরণের জন্যও মানুষকে প্রতিনিয়ত ইচ্ছে খাটাতে হয় ! মানসিক চাহিদাগুলির অতৃপ্তি থেকে দুঃখ কষ্ট ভয় আমাদের মনে বাসা বাঁধে এবং শরীরের উপরও তার যে প্রভাব পড়ে তাতো বুঝতেই পারছো।

এতো গেল মানসিক চাহিদা। আমরা সমাজে বাস করি।

সুতরাং আমাদের মধ্যে সামাজিক কিছু চাহিদাও যে থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় চাহিদা বোধহয়—দল তৈরী করা অথবা কোনও দলের মেম্বার হওয়া। দলটা ছোট হতে পারে—যেমন পাড়ার ফুটবল টীম ; দলটা আবার লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক সংস্থা হতে পারে। সেই দলে ভাঙন দেখা দিলে কিংবা দলের সামনে কোনও সমস্যা এসে পড়লে—অর্থাৎ মানুষের 'দলভুক্ত' হওয়ার সামাজিক চাহিদাটা ক্ষুণ্ণ হলে, নানা ধরনের প্রভাবে পড়ে সেই দলের প্রত্যেকটা লোকের উপর। অতৃপ্ত সেই সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য কারো মনে বিশেষ প্রেরণা জোরদার হয়ে উঠলে সে তখন নতুন দল গড়ে। এও তো সেই ইচ্ছেরই ব্যাপার।

একনাগাড়ে কথাগুলি বলে সরমাদি থামেন। অন্তু জিজ্ঞাসা করে—আমাদের শরীর মনের এই যে এত রকম চাহিদা—এর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেশী জরুরী? কার প্রভাব আমাদের উপর সবচেয়ে বেশী?

—তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই 'মাস্‌লো' নামে এক মনোবিজ্ঞানী গুরুত্বের কমবেশী অনুযায়ী সমস্ত চাহিদার একটা চার্ট বানিয়ে দিয়েছেন। এই চার্টের গোড়াতেই আছে—খাদ্য, পানীয়, ঘুম—ইত্যাদি শারীরিক চাহিদাগুলি ; এগুলির পর নিরাপত্তা, ভালবাসা, আত্মসম্মান ইত্যাদি মানসিক চাহিদার স্থান একের পর এক। ঐ চার্টের ক্রমানুসারেই চাহিদাগুলিকে তৃপ্ত করতে হয় আমাদের। অর্থাৎ ক্ষিধে তেষ্টা না মিটলে মানুষ নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে না, আবার নিরাপত্তার চাহিদা পূর্ণ হবার পরই ভালবাসার কথা ভাবে।

অন্তু গালে হাত দিয়ে সরমাদির কথা শুনছিল। সরমাদি কথা থামিয়ে বললেন—পরীক্ষায় পাশ করার চাহিদাটাও নেহাৎ ফেলনা নয়। সেই চাহিদাটা মেটানোর জন্য এবার তোমার বইপত্তরগুলো নামানো উচিৎ।

অন্তু হেসে উঠে অঙ্ক বইটার দিকে হাত বাড়াল।

□ **অমিত চক্রবর্তী**

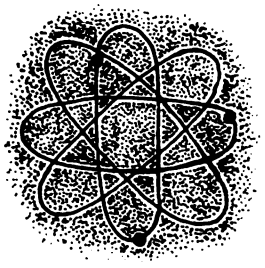

পরমাণু-শক্তির গল্প

লরা ফের্মি

৫

আরও ভাল বুলেট

[কয়েক হাজার বছর আগে ডেমোক্রিটাস পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা হিসেবে পরমাণুর কথা ভেবেছিলেন। তার অনেক বছর পর, ডালটন ১৮১০ সালে তাঁর পারমাণবিক তত্ত্ব দেন। তাঁর তত্ত্বে অনেক কিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও, তিনিও বলেছিলেন পরমাণুকে ভাঙ্গা যায় না। বেকারেল, মাদাম কুরী প্রমুখের গবেষণায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। রাদারফোর্ড পরমাণু ভাঙ্গার পথ দেখালেন। আইরিন কুরী, জোলিও কুরীর কাজে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় বস্তুর আবিষ্কার হয়। পরমাণুর ভিতর যে প্রচণ্ড শক্তি লুকিয়ে আছে মানুষ তা হাতে-নাতে জানতে পারে। এরপর এনরিকো ফের্মি ভিন্ন পথে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা পাওয়ার চেষ্টা করেন। এবং তিনি সফলও হন। তাঁর সেই সাফল্যের কথাই বলি।]

(ক)

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের সংবাদ শুধু ফ্রান্সেই নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও পদার্থবিদ্‌দের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ইটালিতে এই সংবাদ পৌঁছানোর

এনরিকো ফের্মি

সঙ্গে সঙ্গে তরুণ পদার্থবিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মি স্থির করলেন তিনিও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা উৎপন্ন করতে চেষ্টা করবেন। তিনি ভাবলেন, আলফা কণার বদলে নিউট্রনকে বুলেট হিসেবে নিলে শুধু হাল্কা মৌলেই নয় ভারী মৌলেও তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যাবে।

কারণটা ছিল খুবই সহজ-সরল। আলফা কণা ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত বলে যখন পদার্থের মধ্য দিয়ে যাবে তখন দুটো ব্যাপার ঘটতে পারে। নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘূর্ণায়মান ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রনগুলি আলফা কণাকে আকর্ষণ করে তার গতি এত তাড়াতাড়ি কমিয়ে দেবে যে সেও খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণ থেমে যাবে। ফলে, আলফা কণা পদার্থের মধ্যে খুব সামান্য পথই যাবে এবং নিউক্লিয়াস অবধি তার যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আর একটা ব্যাপার যা ঘটতে পারে হল, যদি আলফা কণা কোনরকমে নিউক্লিয়াস পর্যন্ত যায়ও তাহলে সেখানকার প্রোটনে সমপ্রকৃতির ধনাত্মক তড়িৎ থাকায় তারা আলফা কণাকে বিকর্ষণের জন্য দূরে সরিয়ে দিতে চাইবে। এর ফলে আলফা কণা কিছুটা শক্তি হারাবে এবং নিউক্লিয়াসকে ভাঙ্গার মত তত জোরে তাকে হয়ত আঘাত করতে পারবে না।

নিউট্রনের কোন তড়িতাধান না থাকায় ইলেকট্রন তাকে দূরে ঠেলে দেবে না। সে আলফা কণার চেয়ে ত বেশী রাস্তা যাবেই, তার গতিবেগ, শক্তিও অনেক বেশী থাকে। এজন্য ফের্মি ভাবলেন, নিউক্লিয়াসকে ঘা দিয়ে তাকে ভেঙ্গে চুরমার করার সম্ভাবনা নিউট্রনেরই বেশী।

নিউট্রন আলফাকণার মত তেজস্ক্রিয়া পদার্থ থেকে স্বাভাবিক ভাবে আসে না। বেরিলিয়ামের মত মৌলকে কণা দিয়ে আঘাত করে নিউট্রন বের করতে হবে এবং একটি নিউট্রনের জন্য প্রায় এক লক্ষ আলফা কণা দরকার।

ফের্মি সে সময় রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। সেখানে কেউই তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কাজ করেন নি। পরমাণুকে ভাঙ্গার মত কোন যন্ত্রপাতি ল্যাবরেটরিতে ছিল না, তা কেনার মত অর্থও তাঁদের নেই। যা কিছু দরকার ফের্মিকে তা যোগাড় করতে হয়েছিল।

প্রথমেই তাঁর একটি বন্দুকের দরকার হয়েছিল যার থেকে বুলেট হিসেবে নিউট্রন বেরিয়ে আসবে। অন্যান্য বিজ্ঞানী রেডিয়াম থেকে নির্গত আলফা কণা দিয়ে বেরিলিয়ামকে আঘাত করে নিউট্রন পেয়েছিলেন। রেডিয়ামের খুব দাম ছিল বলে রোমে তা ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। ইটালিতে তখন এক গ্রাম রেডিয়ামের দাম ছিল চৌত্রিশ হাজার ডলার (একগ্রাম আর কত হবে এই বই-এর একটা পাতার যা ওজন তাই); বিশ্ববিদ্যালয়ের তা খরচ করার ক্ষমতা ছিল না।

ফের্মি কিন্তু চেষ্টা ছাড়েন নি। তিনি রেডিয়ামের বদলে র‍্যাডন নিলেন। রেডিয়াম ক্ষয় হয়ে এই তেজস্ক্রিয় গ্যাসটি তৈরি হয়। একটি ছোট কাঁচের পাত্রে তিনি র‍্যাডনের সঙ্গে বেরিলিয়াম পাউডার মেশান। এটিই হল তাঁর বহু আকাঙ্খিত বন্দুক।

তেজস্ক্রিয়তা উৎপন্ন হচ্ছে কিনা তা জানার জন্য একটা কিছু উপায় ফের্মির খুবই দরকার হয়েছিল। তেজস্ক্রিয়তার অস্তিত্ব জানার জন্য 'গাইগার গণক'-ই ব্যবহার করা হয়। সব শেষে, যে মৌলগুলিকে তিনি আঘাত করবেন সেই মৌলগুলি তাঁর পাওয়া দরকার। এজন্য তিনি যে মৌল পাবেন তাকে নিয়েই চেষ্টা করতে চাইলেন। তিনি তার একটা তালিকা করে তাঁর এক বন্ধু পদার্থবিজ্ঞানী এমিলিও

সেগ্রেকে সেট দেন। সেগ্রে সেই তালিকা ও একটি ব্যাগ নিয়ে যাঁরাই রাসায়নিক বিক্রি করেন তাঁদের কাছে যান। এইভাবে ফের্মির তালিকামত সব কটি জিনিসই সেগ্রে যোগাড় করেছিলেন।

(খ)

ফের্মি যখন তাঁর তালিকামত সব পেয়ে গেলেন তখন তিনি সবচেয়ে কম পারমানবিক সংখ্যার মৌল হাইড্রোজেন থেকে শুরু করে উচ্চতর পারমানবিক সংখ্যার মৌলকে আঘাত করে চললেন। প্রথমে তিনি সফল হলেন না। হাইড্রোজেন, বেরিলিয়াম, বোরন, কার্বন বা নাইট্রোজেনে নিউট্রন কোন তেজস্ক্রিয়তা উৎপন্ন করলো না। এগুলিকে একে একে আঘাত করার পর গাইগার গণকের কাছে এনে দেখেন সেখানে কোন রকম শব্দ হচ্ছে না।

যখন তিনি নিরাশ হয়ে এই পরীক্ষা ছেড়ে দেবেন বলে তৈরী হচ্ছিলেন তখনই তাঁর জীবনে হঠাৎ একটা পরিবর্তন আসে। ফ্লোরিন নিয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেন, এটি প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয় হয়েছে। তার পরের পারমাণবিক সংখ্যার মৌলগুলিও তাই। এতে আশান্বিত হয়ে আরও কয়েকজন তরুণ পদার্থবিজ্ঞানী ফের্মির এই গবেষণায় যোগ দেন।

তাঁরা একযোগে মৌলগুলিকে আঘাত করে চললেন। তাতে তাঁরা বহু তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক (আইসোটোপ) পান যেগুলি প্রকৃতিতে থাকে না। কখনও কখনও যে মৌলটিকে তাঁরা আঘাত করছেন সেই মৌলেরই তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক তাঁরা পেয়েছেন। যেমন সাধারণ সোডিয়াম থেকে তাঁরা তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম পেয়েছেন, তেমন সাধারণ আয়োডিন এবং আর্সেনিক থেকে তাঁরা পেয়েছেন তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ও আর্সেনিক। তাঁরা আবার ভিন্ন মৌলের তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকও পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ক্লোরিন থেকে তেজস্ক্রিয় ফসফরাস, সিলিকন থেকে তেজস্ক্রিয় অ্যালুমিনিয়াম, এবং লোহা থেকে তেজস্ক্রিয় ম্যাঙ্গানিজ।

তখন ভালো মৌলগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী পারমাণবিক সংখ্যার মৌল হল ইউরেনিয়াম। এই ইউরেনিয়ামকে আঘাত করে তাঁরা যে ফল পেলেন তা বোঝা খুব কঠিন হয়ে পড়লো। তাঁরা দেখলেন ইউরেনিয়াম থেকে একাধিক তেজস্ক্রিয় মৌল হচ্ছে। এদের প্রত্যেকটির পরিমান এত কম যে, এগুলি কী পদার্থবিদরা নিশ্চিত করে তা বলতে পারছিলেন না।

আগের পরীক্ষাগুলিতে, যে মৌলটিকে আঘাত করা হয়েছে সেই মৌল তার কাছাকাছি পারমাণবিক সংখ্যার মৌলের সমস্থানিতে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন, লোহা (পারমানবিক সংখ্যা ২৬) বদলে ম্যাঙ্গানিজের (পারমাণবিক সংখ্যা ২৫) সমস্থানিক হয়েছে।

কিন্তু রোমের ঐ গবেষকরা দেখলেন, ইউরেনিয়ামের অন্তত একটা তেজস্ক্রিয় মৌল ইউরেনিয়ামের কাছাকাছি কোন মৌলের সমস্থানিক নয়। তাঁরা সঙ্গতকারণেই ভেবেছিলেন যে তাঁরা বোধহয় ৯৩ পারমাণবিক সংখ্যার একটি নতুন মৌল বের করেছেন। প্রকৃতিতে কিন্তু এই মৌল নেই। ৯৩ পারমাণবিক সংখ্যার একটি নতুন মৌল তাঁরা বের করেছেন- একথা তাঁরা ভাবলেও, এ ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন না, নিশ্চিত হওয়ার মত কোন পথও তাঁরা পান নি।

৯৩ মৌলটির সম্পর্কে তাঁরা যে সংশয়ে পড়েছিলেন নতুন কোন বিষয়ে কাজ করে করতে গেলে বিজ্ঞানীরা সেরকম অসুবিধের মধ্যে পড়েই থাকেন। এখনকার মত কোন যন্ত্রপাতি তখন রোমের পদার্থবিদদের ছিল না ; এখন আমরা তেজস্ক্রিয় পরমাণু সম্পর্কে যা জানি সে সময় এত সব জানা ছিল না। ইউরেনিয়াম থেকে পাওয়া অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি থেকে খুব সামান্য পরিমাণে অজানা মৌলটিকে পৃথক করার মত কুশলতা কোন বিজ্ঞানীর তখন ছিল না।

ফের্মি বুঝতে পারলেন যে, তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা যতক্ষণ না পরমাণুর উপর নিউট্রন কিভাবে কাজ করে তা ভালভাবে বুঝতে পারছেন ততক্ষন তাঁরা ইউরেনিয়াম থেকে পাওয়া তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি কী জানতে পারবেন না। সেজন্য তাঁরা ইউরেনিয়ামকে বাদ দিয়ে আবার আগের মত অন্য মৌলগুলিকে আঘাত দেওয়া শুরু করলেন, এবং নিউট্রনের আঘাতে এদের কী হয় আরও ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করলেন। এই পরীক্ষাগুলি করার সময়েই তাঁরা একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন।

(গ)

একদিন রোমের পদার্থবিজ্ঞানীরা নিউট্রন দিয়ে এক খণ্ড রুপোকে আঘাত করার সময় অবাক হয়ে দেখলেন—যে তেজস্ক্রিয়তার উদ্ভব হচ্ছে তা সবসময় এক নয়। কখনও সেই একটুকরো রুপো থেকে মিনিটে একশ বিটা কণা বেরোচ্ছে, কখনও বা মিনিটে আশিটি। কিছু পরে তাঁরা দেখলেন যে, রুপো ও নিউট্রন বন্দুকের মাঝে নানারকম জিনিস রাখলে রুপোর সক্রিয়তা বদ্‌লে যায়। যেমন, নিউট্রনের উৎস এবং রুপোর টুকরোর মাঝে সীসার একটি পাত রেখে তাঁরা দেখেন রুপোর সক্রিয়তা কিছু বেড়েছে।

তেজস্ক্রিয়তার এই পরিবর্তন প্রথম প্রথম খুব বেশী ছিল না। একদিন সকালে পদার্থবিজ্ঞানীরা নিউট্রনের উৎস ও রুপোর মাঝে প্যারাফিনের একটা বড় টুকরো রেখে কিছুক্ষণ পরে রুপোটিকে গাইগার গণকে এনে দেখেন গণকে দারুণ শব্দ হচ্ছে—মনে হচ্ছিল সমস্ত যন্ত্রটাই যেন রুপোর ছোঁয়া পেয়ে পাগল হয়ে চীৎকার করছে। প্যারাফিন রুপোর সক্রিয়তা একশ গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল বলেই এটা হয়েছে।

চোখে যা দেখছেন বিজ্ঞানীরা সেদিন তা বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাঁরা চীৎকার করে বলে ওঠেন, 'এটা অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! এ একটা ম্যাজিক!'

নতুন কিছু দেখার উন্মাদনা কেটে যাওয়ার পর ফের্মি সেদিনই বিকেলে এই রহস্যের একটা সম্ভাব্য উত্তর তাঁর সহকর্মীদের জানালেন। তিনি বললেন, 'প্যারাফিনে প্রচুর হাইড্রোজেন আছে। হাইড্রোজেন-নিউক্লিয়াস মানেই সেটি প্রোটন। এর ভর নিউট্রনের সমান। প্যারাফিনকে যখন নিউট্রনের উৎস এবং একখণ্ড রুপোর মাঝে রাখা হয় তখন উৎস থেকে নিউট্রন বেরিয়ে প্যারাফিনের মধ্য দিয়ে গিয়ে তবে রুপোর কাছে হাজির হয়। কিন্তু তার আগে নিউট্রন কণিকাগুলোর সঙ্গে প্যারাফিনের প্রোটনের সংঘর্ষ হওয়ায় নিউট্রন কণার গতি কমে যায়।'

ফের্মি বললেন, ধীর গতির বলগুলোকে যেমন খেলোয়াড়দের পক্ষে শূন্য থেকে অনেক সহজে ধরা সম্ভব হয় তেমনি দ্রুতগতিসম্পন্ন নিউট্রনের চেয়ে ঐ ধীর নিউট্রনেরই রুপোর নিউক্লিয়াসে আটকে পড়ার সম্ভাবনা বেশী। এর ফল হল এই যে, রুপোর অনেকগুলো নিউক্লিয়াস একটা নিউট্রনকে আটকে রেখে ভেঙ্গে যায় এবং তেজস্ক্রিয় হয়ে ওঠে। ফের্মি বললেন যে, প্যারাফিনের মধ্যে হাইড্রোজেনই নিউট্রনের গতি কমিয়ে দেওয়ার দরুণ রুপোর সক্রিয়তা অনেক বেড়ে যায়, তবুও তিনি নিজেই তাঁর এই ব্যাখ্যাতে খুব একটা নিশ্চিত ছিলেন না। তাঁর কথা যদি ঠিক হয় তাহলে আরও বেশী হাইড্রোজেন আছে এমন জিনিষেও (যেমন, জল) একই ফল পাওয়া উচিৎ।

পদার্থবিদরা তা পরীক্ষা করতে চাইলেন। এটা করার সহজ উপায় হল, নিউট্রনের উৎস এবং রুপোকে জলের মধ্যে কিছুটা দূরত্বে রাখা। এর ফলে, উৎস থেকে নিউট্রন বেরিয়ে জলের মধ্যে অনেক বেশী হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসকে ঘা মারতে পারবে এবং রুপোর কাছে যাওয়ার আগেই এই সংঘর্ষের দরুন তার গতিও কমে যাবে। এর জন্যে প্রচুর পরিমাণ জল দরকার। তাঁরা তখন এত উত্তেজিত যে, এই জল রাখার জন্য একটা বিরাট পাত্র খোঁজার মত ধৈর্যও তাঁদের ছিল না। তাঁরা পদার্থবিদ্যার বিল্ডিং-এর পিছনে যে মাছের পুকুর আছে তার মধ্যেই পরীক্ষা করবেন স্থির করলেন।

এখনকার মত রোম বিশ্ববিদ্যালয় একটা জায়গাতেই তখন আবদ্ধ ছিল না, শহরের নানা জায়গায় তার ঘর-বাড়ি ছিল। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের বাড়িগুলি ছিল যেন এক একটা কনভেণ্ট। ফের্মি সেখানকার পুকুরের মধ্যে নিউট্রন বন্দুক এবং একখণ্ড রুপো রেখে পরীক্ষা শুরু করে দিলেন। পুকুরের মাছ ধীর, স্থির থাকলেও মানুষগুলো উত্তেজনায়, আবেগে চীৎকার, চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। প্যারাফিনের মত জলও রুপোর তেজস্ক্রিয়তা বাড়িয়ে দিয়েছে। ফের্মির ব্যাখ্যার একটা জোরালো সমর্থন পাওয়া গেল।

এই ধীর গতির নিউট্রনগুলিই পরে মানুষের কল্যাণে পারমাণবিক শক্তির উদ্ভবে একটা বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। রোমের পদার্থবিদরা সে সময় এই কথাটা ভাবতে পারলে আনন্দে, আবেগে হয়ত আরও অধীর হয়ে পড়তেন। তাঁদের উত্তেজনার শেষ থাকত না। (চলবে)

অনুবাদঃ **লুব্ধক**

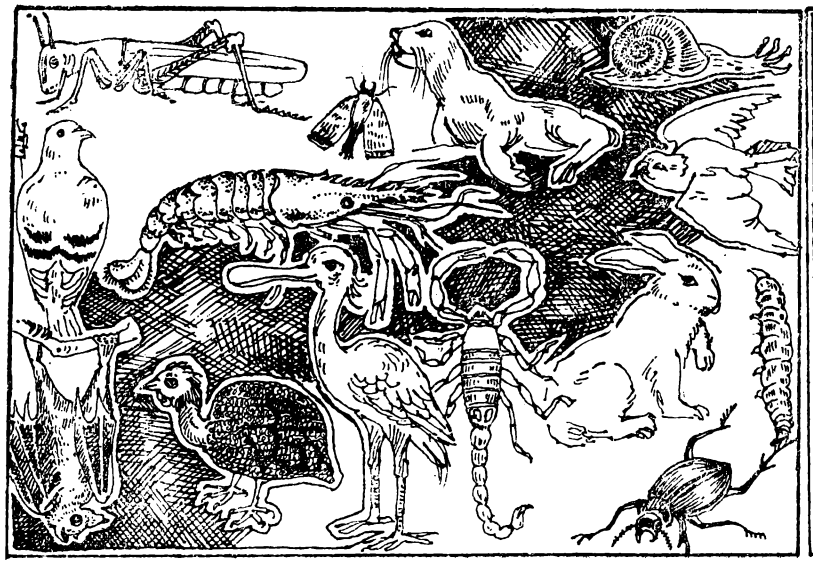

বিশ্বজুড়ে বিচিত্র প্রাণ

কৃষ্ণা ঘোষাল

সন্তান লালন-পালনের ব্যাপারে প্রাণীদের কত না বৈচিত্র্য! স্তন্যপায়ীদের মধ্যেই সাধারণত সন্তানকে লালন পালন করার ব্যাপার স্যাপার চোখে পড়ে। তা বলে এ ব্যাপারটা কিন্তু শুধুই স্তন্যপায়ীদের একচেটিয়া নয়। অমেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে শুরু করে মাছ, উভচর, পাখী— সবার মধ্যেই ডিম পাহারা দেওয়ার, বাসা তৈরী করার, ছোট বাচ্চাকে দেখাশোনা করার কমবেশী প্রবণতা দেখা যায়।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে পোকামাকড়দের কথায় প্রথমে আসি। তবে এরা কিন্তু মূলতঃ ডিমগুলোকেই শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। 'ইয়ার উইগ' নামে একধরনের পোকা আছে। স্ত্রী পোকাটি ডিমগুলোকে রাতদিন পাহারা দেয়। যতদিন না ডিম ফুটে বাচ্চা বেরচ্ছে ততদিন পর্যন্ত স্ত্রী পোকাটি ডিমগুলো ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার রাখে। কয়েক জাতের বোলতা আছে যারা শুধু ডিমগুলোই দেখাশোনা করে না সেই সাথে ছোট বাচ্চার প্রয়োজনীয় খাবারও যোগান দেয়। এরা কি করে জানো! মাটিতে বিশেষ ধরনের গর্ত খোঁড়ে। সেই গর্তের মধ্যে ধরে এনে জমা করে মাকড়সা, ছোট জাতের পোকামাকড়। জমা খাবারের উপর একটা ডিম বসিয়ে রেখে এরা স্রেফ গর্তটা দেয় বুজিয়ে। ডিম ফুটে যে বাচ্চা বেরয় তারা ঐ জমা খাবার দাবার খেয়ে বড় হয়। বড় হলে মাটি ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। কিছু জাতের কাঁকড়া আবার ভারী মজাদার উপায়ে ডিমগুলোকে রক্ষা করে। এরা এদের পেটের দিকে পায়ের উপর ডিমগুলো আটকে রাখে। যাতে ডিমগুলো যথেষ্ট পরিমাণে আলোবাতাস পায় সেজন্য মাঝেমাঝেই শরীর দিয়ে জলে নাড়া দেয়। কিছু কিছু জাতের কাঁকড়াবিছে বাচ্চাদের পিঠে বসিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যায়। কি মজার ব্যাপার বলতো! ভয় পেলে, শত্রু আক্রমণ করলেই ওরা মা-বাবার পিঠে চড়ে বসে। স্ত্রী কেন্নো ডিম পেড়ে ডিমগুলো জড়িয়ে থাকে। তাই মাকে না মেরে শত্রুর পক্ষে ডিমগুলো খেয়ে ফেলা বা নষ্ট করা সম্ভব নয়। এদেরই আবার কেউ কেউ ডিমগুলো এক জায়গায় জড়ো করে তার উপর মাটি চাপা দিয়ে দেয়।

এতো গেল অমেরুদণ্ডী প্রাণীর কথা। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রথমেই মাছেদের কথা মনে পড়ে। সব মাছেরাই কিন্তু বাচ্চাদের দেখাশোনা করে না। একধরনের মাছেরা বাসা বানিয়ে দিয়েই খালাস। আর এক ধরনের মাছেরা যতদিন না ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুচ্ছে, তারা বড় হচ্ছে—ততদিন অব্দি ছানাপোনাদের পাহারা দেয়। আবার মাছেদের মধ্যে বাবারাই সাধারণত বাসা তৈরী করা বা

ডিম পাহারা দেওয়ার কাজটা করে।

কুইন্সল্যান্ড বারনেট নদীতে 'এরিয়াম' নামে এক জাতের মাছ আছে। এরা নদীর ধারে প্রায় কুড়ি ইঞ্চি ব্যাসের একটা গোলাকার গর্ত তৈরী করে। ঐ গর্তের মধ্যে ডিমগুলো রেখে ডিমগুলোর উপর এরা ছোটবড় নুড়ি এনে জমা করে। শত্রুপক্ষের সাধ্যি কি ঐ নুড়ি পাথরের মধ্য থেকে ডিমগুলো আলাদা করে নেওয়ার। স্যালমন মাছেদেরও কেউ কেউ নুড়ি পাথর দিয়ে ঘর তৈরী করে। কিন্তু এরপর ডিমগুলোর কি হলো, বাচ্চারা কে কেমন থাকল বা না থাকল সে বিষয়ে মা বাবার মোটেই মাথাব্যথা নেই। বাচ্চাকে বড় করার ভার এরা যেন প্রকৃতির হাতেই ছেড়ে দেয়। মিষ্টি জলের 'সানফিস'দের ঘর বানানো সত্যিই মজার। এরা গামলার আকারে অগভীর বাসা তৈরী করে। তারপর বাসার তলা থেকে ছোট নুড়িপাথর এক্কেবারে সাফ করে ফেলে। বাসার তলাটা ঢেকে দেয় মিহি বালি দিয়ে। এরপর ঐ বালির বিছানায় ডিম এনে রাখে। ডিম পাহারা দেওয়া, বাসা তৈরী করা সব কাজটাই কিন্তু করে বাবা। আরও বেশ কয়েক জাতের মাছ আছে যারা সানফিসদের মতো বাসা তৈরী করে। কিন্তু সম্পূর্ণ কাজটা মা বাবা দুজনেই ভাগ করে নেয়। 'প্রোটোপটেরাস' নামের কাদামাছেরা কাদার মধ্যে গর্ত খোঁড়ে। বাসার চারধারে ছোটছোট গাছপালা, ঘাস থাকায় এদের ঘর সহজে কারও চোখে পড়ে না। কাদার বাসায় ডিমগুলো বেশ নিরাপদেই থাকে। এরা মাঝেমাঝেই লেজ দিয়ে বাসার আশেপাশের জল খুব জোরে নাড়িয়ে দেয়। ফলে বাসায় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন খুব সহজেই পৌঁছায়। উত্তর আমেরিকার ফুসফুস মাছ 'লেপিডোসাইরেন'। এরা জলাভূমিতে মাটি কেটে ঘর তৈরী করে। ঘরের আকার কোন কোন ক্ষেত্রে তিন থেকে পাঁচ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। ডিম পাড়ার ঋতুতে পুরুষ লেপিডোসাইরেনের শ্রোণী পাখনার কাছে লাল রংয়ের 'ফিলামেন্টের' মতো একটা জিনিস গজায়। ডিম পাহারা দিতে গেলে তো বারবার জলের উপরে মুখ তুলে শ্বাস নেওয়া চলে না। জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন, সে সময়ে শ্বাসকার্য এরা ঐ ফিলামেন্টের মতো জিনিস দিয়ে চালিয়ে নেয়। 'এমিয়া' মাছেদের পুরুষটি শুধু বাসাই তৈরী করে না। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুনোর পরও এদের কাজের অন্ত নেই। এমিয়া মাছের ছোট বাচ্চারা বাবার আদেশ মতো একসাথে বাসা থেকে বার হয়। আবার সাঁতার টাঁতার কেটে সময়মতো বাবার পাহারায় ঘরে ফিরে আসে। বাচ্চারা বেশ খানিকটা বড় হওয়ার পর বাবার ছুটি। 'স্টিকলব্যাক' মাছেদের বাড়ীটা দেখতে অনেকটা সুড়ঙ্গের মতো। সুড়ঙ্গের মুখে বসে পুরুষ স্টিকলব্যাক পাহারা দেয়। আর মাঝেমাঝেই লেজ ও পাখনার সাহায্যে খানিকটা করে পরিষ্কার জল পাঠিয়ে দেয় বাসার মধ্যে, যাতে ডিমগুলো যথেষ্ট পরিমানে অক্সিজেন পায়। ছোটবেলায় মুখে ফুঁ দিয়ে বাতাসে সাবানের ফেনা ওড়ানোর খেলাটা তোমরা সবাই খেলেছ—তাই না? কিন্তু ভাসন্ত বুদ্‌বুদ্‌ কি কারও বাসা হতে পারে? 'বেটা' নামের মাছেদের মুখ দিয়ে বেরয় আঠালো একটা জিনিস। মুখের এই আঠা আর বাতাসের বুদ্‌বুদ্‌ দিয়ে ওরা তৈরী করে জলের উপর ভাসন্ত ফেণার বাসা। এরপর ডিমগুলো নিয়ে পুরুষ 'বেটা' মাছটি আটকে দেয় ঐ ফেনার বাসায়। আঠালো জিনিসটা থাকার জন্য ডিমগুলো মোটেই বাসা থেকে গড়িয়ে জলে পড়ে যায় না। পুরুষ মাছটি এবার পাহারায় বসে। যদি কোন বাসা ডুবে যাওয়ায় সম্ভাবনা দেখে সঙ্গে সঙ্গে সে বাসার ডিমগুলো মুখে করে নিয়ে যায় অন্য আর একটা বাসায়। যতদিন পর্যন্ত না বাচ্চারা বেশ বড় হচ্ছে বাবা এভাবে তাদেরকে রক্ষা করে।

মধ্য ইউরোপের নদীতে 'রোডিয়াম' নামে এক জাতের মাছের বাস। স্ত্রী মাছটি ঝিনুকের খোলার মধ্যে ডিম পাড়ে। শত্রুপক্ষ তো আর ঝিনুকের খোলার মধ্যে ঢুকতে পারবে না। স্ত্রী বা পুরুষ তেলাপিয়া মাছ মুখের ভেতরে বিশেষ ভাবে তৈরী থলিতে ডিমগুলো পুরে রাখে। এমন কি ছোট বাচ্চারা ভয় পেলে ছুটে এসে বাবার মুখের ভেতর ঢুকে পড়ে। ব্রাজিলের নদী নালায় 'প্লাটিসটেকাস' নামে এক জাতের মাছ আছে। ডিম পাড়ার ঋতুতে মা-মাছের পেটের দিকের চামড়াটা ফুলে যায়। সেইসাথে চামড়াটা হয় ভীষণ নরম স্পঞ্জের মতো। যে ডিমগুলো ফুটে বাচ্চা বেরুবে মা তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করে। জড়ো করা ডিমের উপর

এবার মা শুয়ে পড়ে পেট দিয়ে চাপ দেয়। ডিমের উপর ওভাবে চাপ দেওয়ার জন্য খুব স্বাভাবিক ভাবেই মার পেটের নরম চামড়ায় ছোট ছোট পকেট তৈরী হয়। আর ঐ রকম এক একটা পকেটে ডিমগুলো আটকে যায়। যতদিন না ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুচ্ছে মা ততদিন পর্যন্ত ডিমগুলো ওভাবে বয়ে বেড়ায়।

সমুদ্র ঘোড়ার নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। এরা কিন্তু সত্যি সত্যিই ঘোড়া নয়, এক জাতের মাছ। আসলে এদের শরীরের উপরের অংশ অনেকটা ঘোড়ার মুখের সামনের দিকের মতো হওয়ায় এদের চলতি নাম সমুদ্র ঘোড়া। পুরুষ সমুদ্র ঘোড়ার পেটের দিকে একটা থলি থাকে। মা সমুদ্র ঘোড়া ডিমগুলো নিয়ে সোজা চালান করে দেয় বাবার পেটের সেই থলিতে। থলির মধ্যে রেখেই পুরুষ মাছ সে থলিতে তা দেয়।

মাছেদের ক্ষেত্রে যেমন দেখেছি বাচ্চাকে বড় করার ভার যেন অধিকাংশক্ষেত্রেই বাবার. উভচর বা ব্যাঙদের বেলায় কিন্তু তা নয়। এক্ষেত্রে মা-ই ছেলেমেয়ের বেশি দেখাশোনা করে। ব্রাজিলে এক ধরনের গেছো ব্যাঙ আছে ; এদের নাম হাইলা ফেবার। ডিম পাড়ার সময় হলে এরা কি করে জানো ? মা ব্যাঙ গাছ থেকে নেমে আসে। পুকুরের ধারে তৈরী করে অগভীর বাসা। বাসাটা এমনভাবে তৈরী করে যেন বাসাটা চারপাশের জল থেকে একটু উপরে উঠে থাকে। এমন সময়ে এরা ডিম পাড়ে যে ডিম ফুটে ব্যাঙাচিরা বেরুনোর চার পাঁচ দিনের মধ্যেই ঐসব অঞ্চলে বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির জলে পুকুর ভরে যায়। ফলে গেছো ব্যাঙের বাসাও যায় ডুবে । এভাবে সদ্য ফোটা ব্যাঙাচিরা জলে ছাড়া পায়। উত্তর আমেরিকার 'লেপটা ডাকটাইলাস' ডাঙ্গায় বাস করে। কিন্তু ডিম পাড়ার সময় হলে এরা পুকুরের আশেপাশে কাদা খুড়ে বাসা তৈরী করে। মা এবার এক ধরনের ফেনার মতো জিনিস দিয়ে গর্তটা দেয় ভরে। তারপর ঐ ফেনার বিছানায় ডিম পাড়ে। 'অ্যালাইটেস' নামের ব্যাঙেরা একেবারে এক গুচ্ছের ডিম পাড়ে। পুরুষ অ্যালাইটেস ঐ গুচ্ছাকার ডিম কোমরে, পেছনের পায়ের সাথে আটকে নেয়। ডিমগুলো নিয়ে পুরুষ ব্যাঙ আশ্রয় নেয় ছায়াঘেরা ঠাণ্ডা কোন জায়গায়। শুধু মাঝে-মাঝে রাতে বাইরে বেরিয়ে এসে ডিমগুলো শিশিরে কিংবা পুকুরের জলে ভিজিয়ে নেয়। যখন ব্যাঙাচি বেরুনোর সময় হয় পুরুষ ব্যাঙটি সামনাসামনি কোন পুকুরে গিয়ে ডুব দেয়। ব্যাঙাচিরা জলেই বাড়তে থাকে। উত্তর আমেরিকার ছোট্ট ব্যাঙ 'রাইনোডারমা ডারউইনি'। পুরুষ রাইনোডারমা তার গলার কাছে পেটের ঠিক নিচের দিকে একটা ব্যাগের আকারে থলি তৈরী করে। ব্যাগের মতোন থলিতেই এদের ডিমগুলো থাকে। থলির মধ্যে ডিম ফুটে ব্যাঙাচি বের হয়, ব্যাঙাচি বড় হয়। এক সময় বড়সড় ব্যাঙটি বেরিয়ে আসে বাবার মুখ থেকে। জাপানে একজাতের উভচর পাওয়া যায়। এদের নাম ইকথিওফিস্। অনেকটা সাপের মতোন দেখতে—চট করে বোঝা যায় না এরা সাপ নাকি উভচর। এরা এফসাথে প্রায় দু' ডজন ডিম পাড়ে। ডিমগুলো একটার সাথে আর একটা আটকে থাকার জন্য একটা ছোটখাটো বলের আকার নেয়। ডিমের এই বলকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে মা গর্তের বাসায় শুয়ে থাকে। এভাবে এরা অন্যান্য গর্তে বসবাসকারী প্রাণীর হাত থেকে ডিমগুলোকে রক্ষা করে। ব্রাজিলের ব্যাঙ হাইলা গোল্ডি। স্ত্রী হাইলার পিঠের উপরের দিকের একটা অংশের চামড়া ফুলে ভাঁজের মতো তৈরী হয়। মা ডিমগুলো ঐ ভাঁজের মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। 'র‍্যাকোফোরাস' নামের ব্যাঙের একটা প্রজাতির স্ত্রীটি ডিমগুলো পেটের দিকের চামড়ায় আটকে রাখে। উত্তর আমেরিকার ব্যাঙ 'আথ্রো লেপটিস'। এরা খুব স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় ডিম সাড়ে। যতদিন না ডিম থেকে ব্যাঙাচি হচ্ছে বাবা মা ডিমগুলো পাহারা দিতে থাকে। ডিম ফুটে ব্যাঙাচি বেরুলেই মা তাদের পিঠে তুলে নেয়। যতদিন না ব্যাঙাচিগুলো যথেষ্ট বড় হচ্ছে মা এভাবে বাচ্চাদের বয়ে নিয়ে বেড়ায়। আমেরিকায় বাস 'পাইপা ডর সিজেরা'র। মা ব্যাঙের পিঠের চামড়া প্রজনন ধাতুতে খুব

With best compliments from :

A WELL WISHER

নরম হয়ে যায়। বাবা ব্যাঙ মার পিঠের নরম চামড়ায় ডিমগুলো শক্ত করে বসিয়ে দেয়। এরপর ডিমগুলো ঢেকে দেয় পর্দার মতো একটা আস্তরণ দিয়ে। ব্যাঙাচিরা এই পাতলা আস্তরণ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। কিছু কিছু ব্যাঙ আছে যারা ডিম পাড়ার জন্য বেছে নেয় পুকুরের ধারের কোন গাছ। এই গাছের এমন দুটো পাতা বাছে যে পাতাগুলো ঠিক পুকুরের জলের উপরেহ ঝুলে থাকে! এরা দুটো পাতা 'জেলি'র মতো একধরনের রস দিয়ে আটকে তৈরী করে পাতার ঘর। এই পাতার বাসাতেই এরা ডিম পাড়ে।

পাখীরা তো বাসা তৈরী করতে ভয়ানক পটু! বাচ্চা পাড়ার সময় হলে মা-বাবা দুজনেরই ভয়ানক কাজ বেড়ে যায়। বাসা তৈরীর প্রয়োজনীয় খড়কুটো, ভাঙা জিনিসের টুকরো টাকরা, ছেঁড়া নেকড়ার কালি, দড়ি, লোহা কিংবা তামার তার প্রভৃতি জোগাড় করতে হবে তো! পাখীরা কিন্তু ডিমের রক্ষনাবেক্ষণ করেই ক্ষান্ত হয় না। যতদিন না ছানারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা জোগাড় করতে পারছে মা বাবাই এদের খাবারের জোগান দেয়।

হর্নবিল বা ধনেশ পাখির কথা ধর। ডিম বা বাচ্চার ব্যাপারে এরা ভয়ানক সতর্ক। সাধারণত ডিম পাড়ার জায়গা হিসাবে স্ত্রী ধনেশ পাখী গাছের কোটরই বেছে নেয়। এই গর্তের মধ্যে বসে স্ত্রী পাখীটি তার কোটরের সামনে ভিজে মাটি আর নিজের মল দিয়ে তৈরী করে একটা শক্ত দেওয়াল। সিমেন্টের মতো শক্ত এই দেওয়ালে থাকে ছোট একটা ফুটো। ডিম পাড়া, ডিমে তা দেওয়া, ডিম থেকে বাচ্চা বেরুনো অব্দি স্ত্রী-ধনেশকে কোটরের মধ্যেই থাকতে হয়। পুরুষ পাখীটি তখন দিনরাত স্ত্রীটিকে ঐ ফুটোর মধ্য দিয়ে খাবারের যোগান দেয়। বাচ্চা একটু বড় হলেই মা তার ধারালো ঠোঁটের প্রান্ত দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেওয়ালটা ভেঙে ফেলে। বাইরে বেরিয়ে এসে ছানাদের কোটরের ভেতর রেখে আবার আগের মতোনই একটা দেওয়াল তোলে। যতদিন পর্যন্ত না ছানারা ওড়ার উপযোগী হচ্ছে মা-বাবাই তাদের মুখে করে ফুটোর মধ্য দিয়ে খাবার খাওয়ায়।

ব্রডবিলেরা গাছের ডাল থেকে ঝোলানো বাসা তৈরী করে। বাসাটা অনেকটা দেখতে হয় নেসপাতির মতোই। বাসায় ঢোকার বা বেরুনোর মুখ থাকে কিন্তু একটাই। সময়ে সময়ে তারা বাসার উপরে মুখে করে শ্যাওলা, গাছপালার লতাপাতা এনে জমা করে। ওসবের ঝোপের ভিতর যে পাখির বাসা আছে তা কারও পক্ষেই বোঝা সম্ভব হয় না। সাপ, বাঁদর, স্তন্যপায়ী, ছোট ছোট জীবজন্তু—ব্রডবিলের ডিম যাদের প্রিয় খাদ্য বুদ্ধির মারপ্যাঁচে তারা এভাবেই হার মানে।

বাড়ীর আনাচে কানাচে উল্টো কলসীর মতো বাবুই পাখীর বাসা তো তোমরা অনেকেই দেখেছ। এই কলসীর মতো বাসার ভেতরটা ভারী মজার। সেখানে পর পর তাক থাকে। তাকের মধ্যে বাবুই পাখী ডিম পাড়ে। তাকগুলো এমন করে তৈরী যতই বাতাসে বাসা দুলুক না কেন তাক থেকে গড়িয়ে নিচে ডিম পড়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

পেঙ্গুইনের নাম শুনেছ তো! এরা কিন্তু উড়তে পারে না। সমুদ্রাঞ্চলের কাছাকাছি, মরু অঞ্চলে পেঙ্গুইনদের বাস। স্ত্রী বা পুরুষ পেঙ্গুইন তার পায়ের পাতার উপর ডিমটাকে রেখে ঢেকে ফেলে একটা পর্দার মতো পাতলা আস্তরণ দিয়ে। যদি স্ত্রী পেঙ্গুইনটি ডিমটাকে বয়ে বেড়ায়—পুরুষ সঙ্গী যায় খাবারের খোঁজে। প্রায় সাত আট সপ্তাহ ধরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ধীরে সুস্থে পুরুষ সঙ্গী ফিরে আসে। তখন ডিম পাহারা দেওয়ার, রক্ষা করার সব ভার পুরুষ পেঙ্গুইনের।

খরগোসেরা যেখাবে বাচ্চাদের জন্য বাসা তৈরী করে শুনলে তোমাদের হয়তো তাক্ লেগে যাবে। বাচ্চা হওয়ার সময় হলে বাসা তৈরী করার ভার পড়ে পুরুষ খরগোসের উপর। স্ত্রী খরগোস নিজের গা থেকে লোম তুলে তুলে পুরুষ সঙ্গীকে দেয়। পুরুষ সঙ্গী সেই লোম দিয়ে বাচ্চাদের জন্য তৈরী করে লোমের ঘর!

শীগ্‌গীরই বই আকারে বেরচ্ছে

বিশ্বজুড়ে বিচিত্র প্রাণ

সংবেদ

কলকাতা-৯

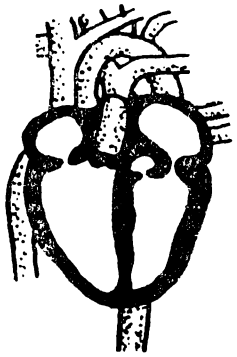

পেস মেকার

ছোটমামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করলো—এবার হাফ-ইয়ার্লীতে গাবলুর খবর কি ?

মুখ টিপে হাসলো টুম্পা।

—সবই ঠিক আছে, তবে বাদ সেধেছে ঐ ইংরেজী ভাষাটা !

—কেন ? ইংরেজীতে কাঁচা বলে যে একজন মাষ্টারমশাই আসছিলেন—ধপ করে সোফাটার কোণে বসে পড়লো ছোটমামা।

গাবলুকে ছোট্ট করে ভেংচি কাটলো টুম্পা। —তোমার ভাগ্নে কতবড় 'জিনিয়াস' তাতো মাষ্টারমশাই জানেন না ! সুতরাং যতই 'পেস মেকার' দিয়ে অচল হার্ট চালাবার চেষ্টা করো না, ফল সেই ছাব্বিশ-ছাব্বিশ বাহান্ন !

—দ্যাখো না ছোটমামা, কাল রেজাল্ট রেরোনোর পর থেকে দিদি এমন করে বলছে। গাবলুর মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়।

—তুই কিচ্ছু ভাবিস না গাবলু। 'অ্যানুয়ালে' গিয়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। আসলে বুঝলি টুম্পা, 'পেস-মেকার' দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এ 'পেশেন্টের' পক্ষে তা মানানসই হয় নি।

—কি ব্যাপার ? কি নিয়ে কথা হচ্ছিল ? কথার মাঝখানে ঘরে ঢোকেন গাবলু-টুম্পার বাবা, সত্যবাবু।

টুম্পা মুচকী হাসে। —না, মানে আমরা 'পেস-মেকার' নিয়ে কথা বলছিলাম আর কি !

—খুব ভাল। আরাম কেদারায় বসে পড়েন সত্যবাবু। আসলে সবই প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ! গত সপ্তাহে বলাইবাবুর বাবার বুকে পেস মেকার বসানো হলো, সেটা 'বুক' করতে গিয়ে জিনিসটা দেখলাম। হ্যাঁ, একটা জিনিষ বানিয়েছে বটে, ছোট্ট একটা লাইটারের মতো চেহারা—কিন্তু কি বিশাল পরিমাণে কাজ করছে ভাবো তো ?

টুম্পা বললো—'বুক' করতে গিয়েছিলে মানে ?

গাবলু এবার ভেংচি কাটলো।

—'বুক' করা মানে জানো না ! অগ্রিম সংরক্ষণ ! এই তো তোমার ইংরেজীর দৌড় !

প্রবল বিরক্তিতে হাত নাড়লো টুম্পা।

—প্রেস মেকার কি ট্রেনের সীট না ভাড়ার জন্য বাড়ী ? অগ্রিম সংরক্ষণের প্রশ্ন আসে কি করে ?

—আসলে জিনিষটা খুব দামী তো ! বারো-চোদ্দ হাজার টাকা দাম। যাঁরা এই জিনিষ তৈরী করেন তাঁরা তো শ'য়ে শ'য়ে তৈরী করবেন না, দরকার মতো তৈরী করে দেবেন। তাই এই বুকিং-এর ব্যবস্থা বুঝলি তো ?

টুম্পাকে ঘাড় নাড়তে দেখে ছোটমামা বললো—এবার তাহলে এক কাপ চা নিয়ে আয় দেখি !

—অথচ দ্যাখো, ব্যাপারটা কি সামান্য ! হার্টের অনিয়মিত স্পন্দনকে নিয়মিত করার জন্য হার্টে ছোট ছোট 'ইলেকট্রিক শক' দেওয়া ছাড়া পেস-মেকারের আর তো কোন কাজ নেই ?

সত্যবাবু নড়েচড়ে বসলেন।

—হ্যাঁ, আপাতভাবে সামান্য মনে হলেও ব্যাপারটা কিন্তু ভয়ংকর রকম জটিল ! ছোটমামা মুচকি হাসে।

—কি রকম ?

পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মোছে ছোটমামা।

—হার্টের একটা বৈশিষ্ট হচ্ছে যে এর বিভিন্ন অংশ মানে অলিন্দ বা নিলয় নিজেদের ইচ্ছেমতো নিজস্ব গতিতে সংকুচিত-প্রসারিত হতে পারে। এ ছাড়া হার্টের সঙ্গে বিভিন্ন স্নায়ুর যোগাযোগ আছে, কেউ সমানে চেষ্টা করছে হার্টকে তাড়াতাড়ি চালাতে, আবার কেউ বা ফাঁক পেলেই হার্টের

গতিকে মন্থর করে দেবে। এই সব নানান ব্যাপার স্যাপারের মধ্যে একটা সুষ্ঠু সমন্বয় করছে হার্টের নিজস্ব 'পেস-মেকার' মানে 'সাইনো অরিকিউলার নোড'। তার কাজ বাইরে থেকে বসানো পেস-মেকার দিয়ে সামলানো মুস্কিল বই কি? নানা কার্য্যকলাপ যোগ-বিয়োগ করে 'নীট ফল' অর্থাৎ প্রতি মিনিটে বাহাত্তরবার সংকোচন-প্রসারণ করানো কি সোজা ব্যাপার?

—মিনিটে বাহাত্তর, মানে দিনে লাখবার। হিসেবটা তাই দাঁড়াচ্ছে তো ছোটমামা? গাবলুর প্রশ্ন।

ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে টুম্পা।

—গাবলু, তোমার অঙ্কের বিদ্যে সম্পর্কে কেউ কোন সংশয় প্রকাশ করেছে কি? আমাদের অভিযোগ ইংরেজীর বিরুদ্ধে!

চায়ের পেয়ালা দুটো টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো টুম্পা।

—কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে ছোটমামা। আমার বন্ধু মিতা—ওর বাবার বুকে 'পেস-মেকার' বসানোর কথা-বার্তা চলছে। এক ডাক্তার বলেন—বসানো দরকার, অন্য ডাক্তার বলেন এখন দরকার নেই। কি ঝামেলার ব্যাপার বল তো? ওরা এখন কোন দিকে যায়? তুমি বরং ছোট্ট করে আমায় বুঝিয়ে দাও তো কখন সত্যি সত্যি 'পেস-মেকার' বসানোর দরকার? আমি অন্ততঃ মিতাকে সেটা বলতে পারবো।

ছোটমামা হেসে ফেললো।

—আসলে রোগীর অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। দুজনেই যদি হার্টের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হন, তাহলে আমার মত—যাঁর অভিজ্ঞতা বেশী, তাঁর মতটাই নেওয়া যুক্তিযুক্ত।

তবে হ্যাঁ, যেটা তুই জিজ্ঞাসা করলি, তার উত্তর হচ্ছে মূলতঃ দুটো অবস্থায় 'পেস-মেকার' বসানো খুব দরকার। এক হচ্ছে হার্ট ব্লক···

টুম্পা বললো—অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে সাইনো অরিকিউলার নোড থেকে বৈদ্যুতিক খবরাখবর সারা হার্টে ঠিকমতো ছড়িয়ে পড়তে পারছে না?

—ঠিক তাই। কতটা হার্ট ব্লক হয়েছে, মানে একদম খবর যাচ্ছে না, কিংবা কম পরিমাণে খবর যাচ্ছে বা মাঝে মাঝে লাইন কেটে যাচ্ছে, তার সেটা বিবেচনা করে পেস-মেকারের সিদ্ধান্ত নিতে হবে!

—অন্য রোগটা কি? সত্যবাবুর জিজ্ঞাসা!

—সেটাও কাছাকাছি ব্যাপার। আমরা বলি 'কার্ডিয়াক অ্যারিদমিয়া' মানে যখন অলিন্দ ও নিলয় ছন্দ মেনে কাজ করে না, একজন নিজের খেয়ালে চলতে শুরু করে। ফলটা বুঝতেই পারছেন—হার্টের এক একটা অংশ খুসিমতো চললে হার্টে রক্ত ফিরে আসা বা পাম্প করে শরীরে রক্ত পাঠানো এই দুয়ের মধ্যে একটা ফারাক বা ছন্দপতন ঘটে যাবে, যার ফলে প্রাণ নিয়ে টানাটানিও বিচিত্র নয়!

টুম্পা বললো—পেস-মেকার বসানোর সময় আসলে কি করা হয়?

ছোটমামা চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুকটা দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখলো। এখন তো পেস-মেকার এবং তার যান্ত্রিক-শক্তির উৎস মানে ব্যাটারী—দুটোই শরীরের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়। 'ইলেকট্রোড' মানে যে অংশটা দিয়ে বিদ্যুৎ-সঙ্কেত পাঠানো হয় সেটাকে হার্টের সঙ্গে ছুঁইয়ে দেওয়া হয় —সরাসরি অপারেশন করে বা 'ক্যাথেটারের' মাধ্যমে কোন রক্তনালী দিয়েই হোক। ব্যাটারীশুদ্ধ মূলযন্ত্রটা বুকের বাঁদিকের দেওয়ালে বা পেটের দেওয়ালে বসিয়ে দেওয়া হয় একটা ছোট্ট অপারেশন করে।

সত্যবাবু বললেন—তাহলে দুনিয়ায় যত লোকের বুকে পেস-মেকার বসানো আছে তা একইভাবে কাজ করছে?

ছোটমামা বললো—ঠিক তা নয়। প্রয়োজন অনুসারে পেস-মেকারেরও শ্রেণীভেদ আছে। কোনটা সব সময়ই একটা নির্দিষ্ট হারে স্পন্দন তৈরী করে, কোনটা আবার চালু হয় হার্ট রেট ষাটের নীচে নামলে তবেই! এগুলোকে বলে 'ডিম্যাণ্ড পেস-মেকার'। তেমনি আবার অলিন্দ বা নিলয় যেটা গোলমাল করছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আছে 'সিনক্রোনাস পেস-মেকার'।

টুম্পা বললো—ব্যাপারটা বুঝলাম না।

—অর্থাৎ এদের স্পন্দন হারটা এমনভাবে ঠিক করা আছে যা শুধুমাত্র অলিন্দ বা নিলয়কে উত্তেজিত করবে। ধর

একটা পেস-মেকারের ছন্দ এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হলো যে ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রামে যেই প্রথম তরঙ্গটা আসবে তার ঠিক দশমিক দুই সেকেণ্ড পরে পেস-মেকার থেকে বিদ্যুৎ-সংকেত আসবে।

—আচ্ছা ছোটমামা, যাদের বুকে পেস-মেকার বসানো হবে তারা তো বেশী দৌড়োদৌড়ি করতে পারবে না?

—ঠিক বলেছিস। এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল তাই। কিন্তু যেহেতু মানসিক উত্তেজনা বা দৌড়ঝাপ করলে শরীরে রক্ত চলাচল বাড়ে, হার্টকে বেশীবার পাম্প করতে হয়, আজকাল এক ধরণের পেস-মেকার তৈরী হয়েছে যেগুলো দু-রকম হারে স্পন্দন পাঠাতে পারে। ধর সত্তর আর নব্বই। স্বাভাবিক অবস্থায় মিনিটে সত্তরবার সংকেত পাঠাচ্ছে, কিন্তু প্রয়োজন হলেই সে নব্বইবার সংকেতও পাঠাতে পারে। শুধু বুকের ওপর একটা সুইচ থাকে সেটাকে ঠেলে দিলেই হলো। আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে সুইচটা উল্টোদিকে ঠেললেই হবে!—বিজ্ঞানীরা এখন 'কম্পিউটারাইজড্' পেস-মেকার তৈরী করেছেন।

—কম্পিউটার মানে ক্ষুদে কম্পিউটার। হার্ট কিভাবে কাজ করছে, তার একশো আঠাশ দিনের তথ্য মনে রাখতে পারবে এই ক্ষুদে কম্পিউটার।

—এতরকম পেস মেকার? সত্যবাবু আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিলেন।

—সেই কথাই তো বলছিলাম। রোগীর চাহিদা অনুসারে 'পেস মেকার' ব্যবহার করতে হবে। এই গাবলুর কথাই ধর না কেন। মাস্টারমশাই ভাল পড়ান নিশ্চয়, কিন্তু উনি উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের ভাল পড়ান—কলেজের ছেলেমেয়ে হলে আরও ভাল। গাবলুর ক্ষেত্রে উনি বোধহয় উপযুক্ত পেসমেকার নন। যাই হোক, আমার জানাশোনা একটি ভাল ছেলে আছে, ইংরেজীতে এম-এ পড়তে। ওকে বরং আমি বলবো গাবলুকে ইংরেজীটা একটু দেখিয়ে দিতে। দেখা যাক 'পেস মেকার' বদলে কোন ফল মেলে কি না! ছোটমামা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

□ **সুভাষ সান্যাল**

জানো কি?

(১) সবচেয়ে উজ্জ্বল গ্রহ কি?

(ক) বৃহস্পতি (খ) প্লুটো (গ) শুক্র

২। কোন্ ভিটামিন রক্ত জমাট বাঁধাতে সাহায্য করে?

ক) ভিটামিন 'সি' খ) ভিটামিন 'ই' গ) ভিটামিন 'কে'

৩। টেপ রেকর্ডারের আবিষ্কর্তা কে?

ক) এডিসন খ) ভাল্ডিমার পলসন গ) রবার্ট ওয়াটসন ওয়াট।

৪। সোডার জলে কোন গ্যাস দ্রবীভূত থাকে?

ক) কার্বনডাই অক্সাইড খ) অক্সিজেন গ) নাইট্রোজেন

৫। কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর সামনের পা ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে?

ক) মাছ খ) প্রজাপতি গ) বাদুড়

৬। স্টীম ইঞ্জিনে যখন রেলগাড়ী চলে তাপশক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?

ক) রাসায়নিক শক্তি খ) যান্ত্রিক শক্তি গ) শব্দশক্তি

৭। মার্স গ্যাসের রাসায়নিক নাম কি?

ক) মিথেন খ) অ্যাসিটিলিন গ) নাইট্রাস অক্সাইড

৮। পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে মরীচিকা দেখা যায়?

ক) মরু অঞ্চলে খ) শীতপ্রধান দেশে গ) উভয় অঞ্চলেই।

৯। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু প্রাণী কে?

ক) জিরাফ খ) হাতি গ) উট

১০। প্রাকৃতিকভাবে 'ফিনল' কিসের থেকে পাওয়া যায়?

ক) মেথিলেটেড স্পিরিট খ) আলকাতরা গ) পেট্রল

১১। ভূমিকম্প মাপার যন্ত্রের নাম কি?

ক) সিস্‌মোগ্রাফ খ) ল্যাকটোমিটার গ) সিম্‌কোগ্রাফ

উত্তর

উত্তর ঃ ১। (গ); ২। (গ); ৩। (খ); ৪। (ক) ৫। (গ); ৬। (খ); ৭। (ক); ৮। (গ); ৯। (ক) ১০। (খ); ১১। (ক)

ধাঁধাঁ

নিশাচর প্রাণী—কৈ বলো দেখি নাম তার,
খাদ্য হিসেবে কেউ দিয়ে থাকে দাম তার।
ওড়ে তবু পাখি নয়, জানে কিছু রংগ,
কখনো খোলস ছাড়ে, জাতিতে পতংগ।
রোগের জীবাণু বয়, আকখুটে সাচ্চা,
বুকে তার নাক থাকে, ডিম ফুটে বাচ্চা।
আর কেউ নাই থাক, আমি আছি সাক্ষী—
শুঁড় দিয়ে ফুল শোঁকে, আছে পুঞ্জাক্ষী।

গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তর ঃ লুব্ধক

সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

সুপ্রতিম ও সুগত দত্ত, সারেঙ্গাবাদ, বজবজ ; কাজী নুরুল আহ্‌মেদ, নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর ; কল্যাণী চক্রবর্তী, বারাসত, ২৪ পরগণা ; অয়ন ঘোষ দস্তিদার, কলকাতা-৬৮।

With best compliments from

'R'

DUCKBACK

Manufacturers & Exporters

BENGAL WATERPROOF LTD.

41, Shakespeare Sarani
Calcutta-700017

Glue Chem brings a New Sensation in Industrial Adhesive World

USER
- CARTON MAKERS
- PHARMACEUTICALS
- BREWERIES
- SOAP INDUSTRIES
- OIL INDUSTRIES
- DISTILLERIES
- CIGARETTE MFGRS.
- BISCUIT FACTORIES
- COSMETICS MFGRS.
- TEA IND.
- DRY & BOTTLED FOOD MFGRS.
- JUTE IND.
- BOOK BINDERS
- LEATHER IND.
- CORRUGATION IND.

GLUE CHEM

MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL ADHESIVES

2, Church Lane, 2nd Floor,
Calcutta-700 001

Phones : 232726, 463812, 621677

Post Regd. WB/SC—200 Vol. 3 No. 5-9 Regn. No. R N. 37306/81

Published by Ashim Chakraborty from 173, Ashokgarh, Cal.-700035 and Printed by Satyanarayan Press, 1, Ramaprasad Roy Lane, Cal.-700006 and Cover Printed by Perfect Press, 32A, Patuatola Lane, Cal.-9